তুঙ্গনাথের পথে - আলোকচিত্রী অরিন্দম পাত্র

বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন

১০ম বর্ষ ২য় সংখ্যা
কার্তিক ১৪২৭

টিকিট কাটা হয়েছিল উত্তরবঙ্গে যাওয়ার। কোভিড হল পরিবারের অন্যান্যদের। বাতিল হল যাত্রা। খুব মনখারাপ নিয়ে পড়তে শুরু করেছিলাম তরুণ তেজপালের প্রথম উপন্যাস 'দ্য অ্যালকেমি অফ ডিজায়ার'। উপন্যাসের মূল পটভূমি গড়ে উঠেছে উত্তরাখণ্ডের হলদোয়ানি আর কাঠগোদাম পেরিয়ে নৈনিতালের প্রবেশদ্বার পাহাড়ি জিয়োলিকোটের একটি একলা বাড়িকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের দুই কেন্দ্রীয় চরিত্র দিল্লিবাসী কথক ও তাঁর স্ত্রী ফিজা বাড়িটি কিনে নেবেন। তারপর সেই বাড়ির অতীতকে কেন্দ্র করে শুরু হবে ঘটনার বিস্তার। পড়তে পড়তে একাত্ম হয়ে যাচ্ছিলাম কথকের সঙ্গে। বাড়িটির বাসিন্দা হয়ে উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি প্রকৃতিকে দেখছিলাম খুব কাছ থেকে। দিল্লি থেকে জিয়োলিকোট প্রথমবার যাত্রার বর্ণনাটিও ছবির মতো। আমার এই জায়গাগুলো দেখা হয়নি। বইটি পড়তে পড়তে একইসঙ্গে ভ্রমণের ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে আবার ভ্রমণসুখও মেটে।

আপাতত মানসভ্রমণেই কাটছে দিনগুলি। অনেকেই কিন্তু বেড়াতেও যাচ্ছেন সাবধানতার নিয়ম মেনে। যেটা ভ্রমণশিল্পের কাছে সুখবর। সময় সুযোগ পেলে আমরাও আবার বেড়িয়ে পড়ব কোথাও। অন্য রাজ্যে যাওয়াটা এখনও খানিক অসুবিধারই। কিন্তু আমাদের রাজ্যে কী নেই – পাহাড় থেকে সমুদ্র। আপনারাও ভালো থাকুন, সাবধানে থাকুন আর নিয়ম মেনে চলতে পারলে কাছেপিঠে কোথাও থেকে দু- চারদিন বেড়িয়েও আসতে পারেন একঘেয়েমি কাটাতে।

\- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় –

"রাস্তার গায়ে এক দিকে গগনস্পর্শী পাহাড়ের দেয়াল আর একদিকে বরাবর হাজার হাজার ফিট নীচু খাদ। সেইদিকে মাত্র তিন ফুট উঁচু পাথর রেলিংয়ের কাজ করছে। কোন রকমে সেই পাথরের বেড়া টপকালেই আর তার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়ার দফা নিশ্চিন্ত। আর এইরকম দারুণ ঢালু পথে বাঁকের মুখে মোড় ফিরবার সময় খুব বেশী ক্ষিপ্রতার প্রয়োজন হয়। এই সময় একটু অন্যমনস্ক বা ঢিলা হ'লেই হয় পাহাড়ের গায়ে বা পাথরের রেলিংয়ে সবশুদ্ধ ধাক্কা। না হ'লে সাইকেল শুদ্ধ পিছলে রেলিং টপকে নীচে পড়া অনিবার্য্য।"

- শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়ের লেখনীতে "সাইকেলে কাশ্মীর ও আর্য্যাবর্ত্ত"র শেষ পর্ব

~ আরশিনগর ~

ওই বাংলার মায়াভরা পথে

– নীলিমা ঘোষ

পাহাড়িয়া পুরুলিয়া – রাহুল দত্ত

~ সব পেয়েছির দেশ ~

বারাণসী ও এলাহাবাদ - তপন পাল

ফিরে দেখা সেই কেদার

– অরুণাচল চ্যাটার্জি

তুঙ্গনাথের পথে – অরিন্দম পাত্র

~ ভুবনডাঙা ~

সুন্দরী নরওয়ে – পদ্মাবতী মন্ডল

দক্ষিণ কোরিয়ার দেগু শহর ও জেজু দ্বীপ – সম্পত ঘোষ

~ শেষ পাতা ~

কেরালার থেইয়াম উৎসব – পঙ্কজ দত্ত

বিষ্ণুপুরের কৃষ্ণরাই মন্দিরের টেরাকোটার কাহিনি – অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে কর্মাটাঁড়ে – অজিত রায়

© 2011 - 2020 AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

= 'আমা

বেড়ানোর মতই বইপড়ার আদতও বাঙালির চেনা সখ – তা ছাপা হোক বা ই-বুক। পুরোনো এই ভ্রমণ কাহিনিগুলির নস্টালজিয়া তাতে এনে দেয় একটা অন্যরকম আমেজ। আজকের ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি লেখক-পাঠকেরা অনেকেই শতাব্দীপ্রাচীন সেইসব লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পাননি। পুরোনো পত্রিকার পাতা থেকে অথবা পুরোনো বইয়ের নির্বাচিত কিছু অংশ তাই পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে 'আমাদের ছুটি'-র পাঠকদের জন্য।

['সাইকেলে কাশ্মীর ও আর্য্যাবর্ত্ত' –এই ভ্রমণকাহিনিটি ধারাবাহিকভাবে বেরোত প্রবাসী পত্রিকায় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। লেখক শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায় বিশেষ পরিচিত কোনও নাম নয়। আজকের ইন্টারনেট-গুগুল ম্যাপ-ইন্সটাগ্রাম-ফেসবুক লাইভ যুগের তরুণ-তরুণীদের জন্য এখানে রইল প্রায় একশো বছর আগের কয়েকজন অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় বাঙালি তরুণের ভ্রমণকথা।]

সাইকেলে কাশ্মীর ও আর্য্যাবর্ত্ত

শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়

পূর্বপ্রকাশিতের পর -

২০ শে অক্টোবরঃ - সকাল সাতটা। কুয়াশায় চারিদিক্ অন্ধকার। আকাশ পরিষ্কার হ'লে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লাম আস্তানার খোঁজে। রাস্তায় কোথা থেকে পুলিশ এসে পাকড়াও করলে। সমস্ত খোঁজ-খবর নেওয়া হ'লে তাদের কাছ থেকে আমরা খবর নিয়ে এখানকার মিলিটারী একাউন্টসের শ্রীযুক্ত চুণীলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে হাজির হ'লাম।
শিয়ালকোটে যে ক্রিকেট ব্যাট, পোলো-খেলার ছড়ি প্রভৃতি খেলাধূলার সরঞ্জাম তৈয়ারী হয় সে-কথা বোধ হয় সবাই জানেন। জম্মু এখান থেকে মাত্র ৩১ মাইল দূর। জম্মুর এত কাছে এসে আবার পাঞ্জাবে এক রাত কাটাতে মন চাইলে না। সেজন্য বেলা তিনটের সময় জম্মুর পথে সাইকেল চালিয়ে দেওয়া গেল।
সহরের সীমানা ছাড়িয়ে বাঁ দিকে চাইতেই দেখা গেল দূরে, বহুদূরে বরফে-ঢাকা সাদা পাহাড় সূর্য্যের আলোয় ঝলমল করছে। তার পায়ের নীচের দিগন্তবিস্তৃত অসীম মাঠের যেন আর শেষ নেই। এরই কোণ ঘেঁসে সাদা রংয়ের সরু পথটি জম্মুর দিকে চ'লে গেছে। কয়েক মাইল পরে এই পথের ওপর এক লোহার প্রকাণ্ড ফটকের মাথায় ইংরেজীতে বড় বড় ক'রে লেখা আছে - হল্ট (Halt)। এইখানে গাড়ী ঘোড়া মোটরের জন্য মাশুল আদায় হয়। কয়েকটি মোটর ফটকের এদিকে দাঁড়িয়ে ষ্টেটের কর্ম্মচারীদের কাছে মাশুল দিয়ে ছাড়পত্র সংগ্রহ করছে। আমরাও নেমে' পড়ে' অপেক্ষা করতে লাগলাম - কখন্ আমাদের ডাক পড়ে। কিন্তু আমাদের দিকে দেখেও কেউ মনঃসংযোগ করা দরকার মনে করলে না। অগত্যা আমরা আর মিছামিছি দেরী না ক'রে সাইকেলে উঠে পড়লাম। ক্রমশঃ পথটি ঢালু হ'য়ে হঠাৎ এক নদীর ধারে এসে' পড়ল।

ঢালু রাস্তা থেকে ওপরে উঠে একটা বাঁক ফিরেই আমরা একটি প্রকাণ্ড পর্ব্বতশ্রেণীর সুমুখে এসে পড়লাম। সুবিশাল হিমালয়ের এক শ্রেণীর গায়েই জম্মু সহর। সবুজ রংয়ের পাহাড়ের গায়ে জম্মুর সাদা সাদা অসংখ্য মন্দির যেন ছবির মতই সুন্দর। জম্মুর মন্দিরের চূড়াগুলি পিতলের পাতে মোড়া। এই চড়াইয়ের উপরে উঠে দেখা গেল, জম্মুর পিছনে অসংখ্য পাহাড়ের শ্রেণী - তাদের মাথা গিয়ে আকাশ ঠেকেছে। এইখান থেকে হঠাৎ চড়াই সুরু হ'ল। এই পাহাড়-পর্ব্বত পার হ'য়ে শ্রীনগরে পৌঁছতে হবে। রাস্তার নমুনা দেখে বোঝা গেল, এইবার এই পথ দিয়ে পাড়ি লাগান বাস্তবিকই একটু শক্ত ব্যাপার। জম্মু ক্যান্টনমেন্ট্ বেশ বড়। সহর ও ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে তাউই নদী। তাউইয়ের ওপর তারের ঝোলান পুল। এই পুল পার হ'লেই জম্মু সহর।
সহরে ঢুকেই শ্রীনগরের পথ কেমন তাই দেখবার জন্যে সবাই ঝুঁকে পড়ল। সেইজন্যে শ্রীনগরের রাস্তায় খানিকটা এগিয়ে গেলাম।

পথটি সহরের বাইরে দিয়ে বরাবর দুই মাইল চলে' গিয়ে রামনগর রাজপ্রাসাদের সুমুখ দিয়ে কাশ্মীর অভিমুখে গেছে। এই দুই মাইল পথ সবটুকুই চড়াই। রামনগর জম্মু সহরের সীমানা ও সহরের মধ্যে সব-চেয়ে উঁচু জায়গা। এইখান থেকে আবার সহরের মধ্যে ফেরা গেল। এবার বরাবর উৎরাই। চোখের নিমেষে তাউইয়ের ঝোলান পুলের সামনে এসে পড়লাম। সহরের ভেতরে যেতে বরাবর চড়াই আর এদিকে আসতে হ'লে বরাবর উৎরাই। এখানকার পথ-ঘাট অতি সুন্দর। বাজার-হাট পাথর দিয়ে বাঁধান। কলের জলের কোন ট্যাকস্ নেই, মহারাজ বারমাস প্রজাদের জল দান ক'রে পুণ্য সঞ্চয় করেন।

আমরা ধর্ম্মশালা বা সরাইয়ের খোঁজ নিতে ব্যাগ্র হ'য়ে পড়লাম। ধুতিচাদর পরা একটি ছেলেকে এদিকে আসতে দেখা গেল। এগিয়ে জিজ্ঞাসা কর্লাম, "ভাই, এখানে কাছাকাছি সরাই-টরাই কোথায় আছে বলতে পার?" "আপনারাই বুঝি কলকাতা থেকে এসেছেন?" "হাঁ সরাই বা ধর্ম্মশালা" - "আমাদের বাড়ী যাবেন না?" এরকম প্রশ্নে বেশ কৌতুক বোধ করলাম। বললাম "চল"। তাউই পুলের সাম্নে এক বাড়ীর সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে ছেলেটি তাড়াতাড়ি উপরে চ'লে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যে এক সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোক নেমে এসে বল্লেন "এ্যাঁ, আপনারা - আজ্ঞে হ্যাঁ, কলকাতা থেকে আসচি, এখানে সুবিধা-মতন একটা জায়গা" - "আচ্ছা আচ্ছা সব বন্দোবস্ত হ'য়ে যাবে, ভেতরে আসুন।"

আজ মোট ৩১ মাইল আসা হয়েছে। মিটারে উঠেছে ১৪.৮। ২১, ২২, ২৩ ও ২৪শে অক্টোবর। - জম্মু মাত্র ১৫০০ ফুট উচ্চ ও কাশ্মীর ষ্টেটের শীতকালের রাজধানী। শীত কাশ্মীরের চেয়ে অনেক কম। মহারাজ প্রতাপ সিং এর মৃত্যু উপলক্ষ্যে এখানে এখন সব প্রকার আমোদ-প্রমোদ বন্ধ, এমন-কি বাড়ীতে গান-বাজনা পর্য্যন্ত বারণ।

২১শে সকালে জম্মুর রাস্তা লোকজনে পরিপূর্ণ। সকলেই উদগ্রীব হ'য়ে শ্রীনগরের পথের দিকে মৃত মহারাজের শবাধারের জন্য অপেক্ষা কর্ছে। বার জন সৈনিক শবাধারে রক্ষিত ভস্ম শ্রীনগর থেকে বহন ক'রে হরিদ্বারে নিয়ে যাবে। এই দীর্ঘপথ এক এক দল পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্য মৃত মহারাজার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য শ্রীনগর থেকে বরাবর হরিদ্বার পর্য্যন্ত সামরিক প্রথায় শবাধারের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

জম্মুর বিজলীঘরের বৈদ্যুতিক শক্তি জলের সাহায্যে উৎপাদন করা হয়। চেনাব নদী থেকে এই উদ্দেশ্যে জম্মু অবধি একটি খাল কেটে আনা হয়েছে। এই খালের জলকে আবার জলসেচ কাজেও লাগান হয়।

জম্মুতে স্কুল কলেজ লাইব্রেরী এমন কি ছোট খাট একটি মিউজিয়মও আছে।* লোকদের পোষাক-পরিচ্ছদ পাঞ্জাবীদের মতই। এরা নানা প্রকার উজ্জ্বল রংয়ের পোষাক পরতে ভালবাসে। এখানকার অধিবাসীরা বেশীর ভাগই হিন্দু, ডোগরা, রাজপুত শ্রেণীর ও বেশ সুশ্রী। মেয়েরা চালাক চতুর ও স্বাধীন ভাবাপন্ন। জম্মু থেকে একদিনের পথ ত্রিকুটা দেবী এ-অঞ্চলের নামজাদা তীর্থ। পাঞ্জাব থেকে প্রতিবৎসর অনেক যাত্রী ত্রিকুটায় তীর্থ করতে আসেন। মেয়েদের উৎসাহ এবিষয়ে বোধ হয় সব দেশেই বেশী। তাঁদের মধ্যে অনেকে এই দুর্গম গিরিপথ টোঙ্গার অভাবে অশ্বারোহণে অতিক্রম করছেন।

*এখানকার ডাক-বিভাগ গভর্ণমেন্টের কিন্তু টেলিগ্রাফ অফিসগুলি ষ্টেটের।

বাঙালীর সংখ্যা জম্মুতে খুবই কম। তাঁদের প্রায় সকলই এখানকার বিশিষ্ট কর্ম্মচারী। একজন বাঙ্গালী মহিলাও নিজে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করেন। মোবারক মণ্ডি বা পুরাতন রাজপ্রাসাদের কাছেই কাশ্মীরের ষ্টেট কাউন্সিলের সিনিয়র মেম্বর ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী। ইনি পূর্ব্বে মহারাজের প্রধান জজ ছিলেন।

এইখানে আমাদের গরম কাপড়-চোপড় না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'বে। জম্মু-শ্রীনগরের পথ রাওলপিণ্ডির পথের চেয়ে দুর্গম ও সম্প্রতি তৈরী হয়েছে বলে' রাওলপিণ্ডির পথের মত ভাল বন্দোবস্ত এখনও হ'য়ে ওঠেনি।

শ্রীনগরের দূরত্ব, চড়াই ও বনিহাল গিরিসঙ্কটের তুষারপাত ইত্যাদির উল্লেখ ক'রে সকলেই আমাদের এই দুঃসাহসিকতা থেকে বিরত হ'তে অনুরোধ করতে লাগলেন। গিরিপথের নানাপ্রকার কষ্ট ও তুষারপাতের বিভীষিকার কথা যতই শুনতে লাগলাম এ-পথ দিয়ে শ্রীনগর পৌঁছবার আগ্রহও ততই বাড়তে লাগল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কেবল যথেষ্ট উৎসাহান্বিত করেছিলেন। এঁর সাহায্যেই আমরা এই পথের একরকম একটি মানচিত্র খাড়া করি। কোনো কাজ করতে বেরিয়ে কেবল বিপদের কথা শুনে' পেছিয়ে যাওয়া তিনি পছন্দ করতেন না। সেইজন্যেই বোধ হয় এ'র সঙ্গে আমাদের এমন ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে উঠেছিল।

২৪শে সকালে আমাদের গরম কাপড়-চোপড় এসে পৌঁছল। এইজন্যেই আমাদের এই কয়দিন জম্মুতে আটকে থাকতে হ'ল। ক্রমাগত চারদিক্ থেকে 'নিরাশার সুর' শুনে মন বড়ই চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল। জম্মু আর যেন কিছুতেই ভাল লাগছিল না। আর দেরী না করে' পরদিন সকালেই যাতে রওনা হ'তে পারি তার যোগাড়-যন্ত্র করতে শুরু করে' দিলাম। কি করে' আমাদের এই অভিযানকে সফল করে' তোলা যায় সন্ধ্যাবেলায় তারই বৈঠক বসল।

২৫ শে অক্টোবর রবিবার। - বেশ পরিষ্কার সকাল। রামনগর প্রাসাদের সুমুখ দিয়ে শ্রীনগরের পথ। প্রাসাদের কিছু দূরেই জম্মু সহরের সীমানা। জায়গাটায় বেশ একটা লম্বা উৎরাই। এই উৎরাইয়ের মুখে একজন উর্দ্দিপরা পুলিস কর্ম্মচারী মাথার ওপর দু'হাত তুলে আমাদের থামাবার জন্য ইঙ্গিত করতে লাগল। নেমে পড়ে শুনলাম যে, আমাদের আবার ফিরে সহরের মধ্যে পুলিস অফিসে যেতে হ'বে। এদের হাতে পড়লে অনেকটা সময় বৃথা নষ্ট হ'বে ভেবে আমরা তাকে বুঝিয়ে নিরস্ত করতে চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু তার কাছে উর্দ্দুভাষায়, পাঞ্জা মারা হুকুমনামা দেখে সে আশা পরিত্যাগ করতে হ'ল। অগত্যা আবার সহরের মধ্যে পুলিশ অফিসে ফিরে এলাম। সেখানে মিছামিছি ঘন্টা দুয়েক বসিয়ে রেখে মামুলি নাম ধাম লেখার পর নিষ্কৃতি পেয়ে জম্মু থেকে দ্বিতীয় দফা রওনা হলাম বেলা ১০ টায়।

ছ' মাইল উৎরাইয়ের পর ছোট চটি নাগরোটা। এইবার গিরিপথের সুবিধা-অসুবিধা বেশ বুঝতে পারা গেল। মাথার ওপর থেকে পথের আশেপাশে এক-একটা প্রকাণ্ড পাথরের চাঙ্গড় বার হ'য়ে রয়েছে। মনে হয় বুঝি ঘাড়ে পড়ল। ঘন ঘন বাঁকের জন্য পথের অবস্থা কিছু বুঝবার উপায় নেই। লম্বা উৎরাই দিয়ে নামতে নামতে বাঁকের মুখে এসে বুকটা ছ্যাৎ করে' ওঠে; কি জানি ওদিকে কি আছে; কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে, বাঁকের ওদিকে হয়ত পাহাড় থেকে ধস্ নেমে রাস্তা একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেছে। সেরকম জায়গায় ঠিক সময়মত গাড়ী থামাতে না পার্লে দুর্ঘটনা অনিবার্য্য। আবার ও রকম দ্রুতগতিশীল সাইকেলকে হঠাৎ ব্রেক (Brake) ব্যবহার করে' থামানও বিপদজনক। তা ছাড়া পরে দেখেছিলাম যে, খুব লম্বা ঢালু পথে অনবরত ব্রেক্ ব্যবহার করলে সাইকেলের চাকা

(Rim) ক্রমশঃ জখম হ'য়ে যায়।
নাদানি অপেক্ষাকৃত বড় চটী। এর উচ্চতা প্রায় ৫০০০ ফিট। দেশী ভাষায় সেইসব হোটেল বা দোকানকে বলে তন্দুর। নাদানি থেকে মাইল তিনেক পর ত্রিকুটাদেবীর মন্দিরে যাবার রাস্তা। ত্রিকুটাযাত্রীদের ভিড়ে চটী আজ সরগরম। যাত্রীরা সকলেই এখানে খাওয়াদাওয়া সেরে নিচ্ছে। চটীর শেষেই প্রায় সিকি মাইল লম্বা এক সুরঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ পার হ'য়ে আমরা আবার সাইকেল চালিয়ে দিলাম। ক্রমাগত চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে বেলা প্রায় চারটার সময় উপস্থিত হ'লাম উদমপুরে। উদমপুর সহর রাস্তা থেকে প্রায় তিন চারশ ফিট উঁচু একটা বড় টিলার উপর। আজকে এইখানেই রাত কাটাবার ব্যবস্থা ক'রে ফেললাম। এখানকার ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত পতিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে জম্মুতেই আলাপ হয়েছিল। তাঁরই বাংলোর সামনে এক তাঁবুতে আস্তানা নেওয়া গেল। উদমপুরের উচ্চতা প্রায় ২৫০০ ফিট। জম্মু ১৫০০ ফিট; কিন্তু এই ১০০০ ফিট ওঠার জন্য আমাদের ৫০০০ ফিট পার হ'য়ে আস্তে হ'ল। আজকের দৌড়, মাত্র ৪১ মাইল; কিন্তু জম্মুর কয়দিনের ঘোরাঘুরির জন্য দেখা গেল মিটারে উঠেছে ১৪৫৬।

২৬ শে অক্টোবর, সোমবার। - তাঁবুর গায়ে বৃষ্টির টুপটাপ শব্দে ভোরবেলায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। কম্বল থেকে গলা বার ক'রে কানাতের ফাঁক দিয়ে আকাশের অবস্থা দেখে বড় নিরাশ হ'য়ে গেলাম। মেঘে সব পাহাড়ের ওপর একেবারে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার। বনিহাল গিরিসঙ্কটে তুষারপাতের জন্য আমরা সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছি। কাশ্মীর পৌঁছবার জন্য আরও আগে চেষ্টা করা উচিত ছিল। এই প্রচণ্ড শীতের ওপর যদি বরফ পড়তে আরম্ভ করে তবে হয়ত কাশ্মীর পৌঁছান সুদূরপরাহত হ'য়ে উঠবে। সেপ্টেম্বরের পর বনিহাল গিরিসঙ্কট দিয়ে এভাবে শ্রীনগর যাওয়া বড় বিপদজনক। এইসব কথা আমরা জম্মু থেকে শুনেছি। জম্মু থেকেও একরকম সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে চ'লে এসেছি। এখানকার একমাত্র বাঙালী ও আমাদের আশ্রয়দাতা ইঞ্জিনিয়ার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও বলছেন, এ চেষ্টা অন্ততঃ এ বছরের মত পরিত্যাগ করতে। চারদিক অন্ধকার, চুপচাপ, কেবল তাঁবুর কানাতে বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ; প্রকৃতির কেমন যেন একটা নিরানন্দ ভাব। সময়ের দাম এখন আমাদের কাছে বড় বেশী। গিরিসঙ্কটে যে কোন দিন থেকে তুষারবর্ষণ সুরু হ'তে পারে। হয়ত আজকের দিনের এই ব'সে থাকার জন্য যে সময় নষ্ট হচ্চে সেই সময়টুকুর জন্য পরে আপশোষের সীমা থাকবে না; সেই সময়টুকুর অভাবই হয়ত বনিহাল-সঙ্কট পার হওয়ার অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াবে। অথচ এই বৃষ্টির মধ্য দিয়েই বা কি ক'রে অগ্রসর হওয়া যায়! আর এই দারুণ শীতে, ভিজা কাপড়-চোপড় গায়ে থাকলে ত সঙ্গে-সঙ্গে অসুখ, নিউমোনিয়া বা আর কিছু। এই রকম ভাবনার মাঝখানে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁবুর ভেতর এসে উপস্থিত হ'লেন; কথাবার্ত্তা সুরু হ'ল।
"দেখছেন ত! এ রকম দুর্য্যোগে আপনাদের আর অগ্রসর হওয়া উচিত হবে না।"
"এতদূর এসে পেছিয়েই বা যাই কি ক'রে বলুন?"
"কিন্তু কি ক'রে যাবেন? এ পাহাড়ে দেশের কিছু ঠিক নেই। এই যে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে হয়ত সাত আট দিন ছাড়বেই না। এ যেরকম দুর্য্যোগ দেখছি তাতে বোধ হয় বনিহালে বরফ পড়তে আরম্ভ হ'য়ে গেছে। আপনাদের এইরকম সামান্য শীতবস্ত্র নিয়ে যে কি ক'রে যাবেন তাও ত ভেবে পাচ্ছি না। এবার বরঞ্চ ফিরে যান।"
বিকাল চারটার সময় বৃষ্টি থামল। আমরা দেখলাম, এই সুযোগ। আর একটুও দেরী না করে' নিজেদের জিনিসপত্র বাঁধাবাঁধি করে' নিয়ে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে একরকম দেখা না করে'ই বেরিয়ে পড়লাম।

বেলা পাঁচটা। কোথায় চলেছি ঠিক নেই। মাথার ওপর দিয়ে দু'তিন পসলা বৃষ্টি হ'য়ে গেল। বড়বড় চড়াই। এ রাস্তায় সাইকেল চালান অতি কষ্টকর। তার ওপর উল্টা দিক থেকে ঝড়ের মত জোরে হাওয়া বইছে। সামনে-পিছনের কারু সঙ্গে কথা বলতে হ'লে চীৎকার ক'রে না বললে কিছু শোনবার উপায় নেই। প্রায় তের মাইল এই রকম হেঁটে সন্ধ্যার পর ধরমতল ব'লে একটা ছোট জায়গায় উপস্থিত হ'লাম। পাহাড়ের ওপর একটা টিলার মাথায় সরকারী বাংলো (Rest House) দেখে মনে মনে ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে সেইখানে ঢুকে পড়লাম।
এই পাহাড়ের মধ্যে, নেহাৎ ছোট একটা গ্রামে একজন বাঙালীর সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমরা বড়ই উপকৃত হয়েছিলাম। শ্রীযুত গুরুদাস বিশ্বাস এখানকার ওভার্সিয়ার। তাঁরই অনুগ্রহে আমরা ঘরের ভিতর সারারাত চিমনী জ্বালাবার মত কাঠ পেলাম। এই দারুণ শীতে, ভিজে কাপড়ে রাত কাটাতে হ'লে বড়ই মুস্কিলে পড়তাম। ওরই মধ্যে যেটুকু সুবিধা ক'রে নেওয়া যায় তাই ক'রে ফেললাম। আগুনের চার দিকে ভিজে জামা প্যান্ট সব শুকাতে দিয়ে, এবার কি করা যাব তারই আলোচনা সুরু করলাম। আকাশের অবস্থা বড়ই খারাপ। মনটা আরও যেন দমে' গেল। আজকের দৌড় ঐ ১৩ মাইল - মিটার বল্ছে ১৪৬৯।

২৭ শে অক্টোবর, মঙ্গলবার। - শীতের সকাল। মেঘে মেঘে আকাশ অন্ধকার। এত বৃষ্টির পরও আজ সমস্ত দিনেও যে বৃষ্টি ছাড়বে তার কোন লক্ষণ বোঝা যাচ্ছে না। চারিদিক নিস্তব্ধ। এমন দিনে ঘরের ভেতর আগুন জ্বেলে ব'সে প্রিয়-পরিজনের সঙ্গে গল্পগুজব ক'রে কাটিয়ে দিতে বেশ ভাল লাগে। কিন্তু আমাদের মনের অবস্থা তখন অন্য রকম। সঙ্গে রসদ-পত্র খুবই অল্প, টাকার জোরে অনেক সাহায্য ও সুবিধা এই জনহীন দুর্গম স্থানে ক'রে নেওয়া যায়, সেই জোরও ক্রমশঃ কমে' আস্ছে। সুমুখে ক্রমাগত চড়াই-উৎরাই পথ - শ্রীনগর এখনও ১৫২ মাইল দূর। আকাশের অবস্থা ক্রমশই খারাপ থেকে আরও খারাপ হ'য়ে আসছে। তার ওপর ক্রমাগত ঠাণ্ডা লাগার দরুণ ও ভিজে কাপড়ে থাকার জন্য সর্দ্দি-কাশিতে প্রায় সকলেই অল্প-বিস্তর ভুগছে। এ পথে যদি কারও অসুখ-বিসুখ হ'য়ে পড়ে তবে আর মুস্কিলের সীমা থাকবে না। উদমপুরের পর থেকে শ্রীনগরের আগে আর ডাক্তার বা হাঁসপাতাল কিংবা চিকিৎসা বিষয়ের কোন সাহায্য কোথাও পাওয়া যাবে না। বৃষ্টি-বাদলের জন্য অসুখ-বিসুখ হ'য়ে বা অন্য কোন কারণে যদি পথে কোথাও আটেক পড়তে হয় তবে খরচ-পত্রের জন্য টাকা-কড়িও শ্রীনগরে পৌঁছবার আগে পাবার উপায় নেই। এইসমস্ত বিষয় ভেবে, সঙ্গে যা টাকা-কড়ি আছে তাতে দেখা গেল সকলের চলা অসম্ভব। অথচ এইসব কারণের জন্যে নিজেদের লক্ষ্য - এতদিনের পরিশ্রম ও অবিশ্রান্ত চেষ্টার পর যে ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসতে হ'বে - সে কথা ভাবতে গেলেও মন তাতে সাড়া দিতে চায় না বরং বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে।
ধরমতলের সেদিনের কথা (২৭শে অক্টোবর) অনেকদিন আমাদের মনে থাকবে। বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, পথঘাট জনহীন, চারদিক্ নিস্তব্ধ আর ঘরের ভিতর আগুনের চারপাশে আধভেজা আধশুকনো কম্বল জড়িয়ে শীতের হাত থেকে আমাদের পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা। কি ক'রে আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল ক'রে তোলা যায়, গন্তব্য স্থানের এত কাছাকাছি এসেও এই অভিযান যাতে ব্যর্থ হ'য়ে

না যায় - আর তার জন্যে এখন, এ অবস্থায় আর কি রকম চেষ্টা বা ত্যাগ স্বীকার করা দরকার তারই আলোচনা।
সব দিক্ দিয়ে দেখা গেল যে, আমাদের সকলেরই শ্রীনগর অবধি যাওয়া বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভবপর নয়। কাজে-কাজেই কে কে অগ্রসর হবে আর কে-ই বা ফিরে যাবে তাই নিয়ে এখন মুস্কিল বাধল। বিষয়টার গুরুত্ব বুঝে শেষে আনন্দ ও নিরঙ্কের জম্মু ফিরে যাওয়া আর মণি ও আমার শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়া স্থির হ'য়ে গেল। এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'তে যে কত দীর্ঘ সময় তর্ক-আলোচনায় অতিবাহিত কর্তে হয়েছিল, জন-মানব-বিরল পাহাড়ে দেশের সেই ছোট ঘরখানায় যে, সে দিন কি উত্তেজনার সৃষ্টি ক'রে তুলেছিলাম তা আজও বেশ মনে পড়ে। আর এত পরিশ্রম, এত চেষ্টার পর গন্তব্যের এত কাছাকাছি এসেও যদি কাউকে দলছাড়া হ'য়ে ফিরে' যেতে হয় কেবল নিজেদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে সফল ক'রে তোল্বার জন্যে, তবে তাদের সে ত্যাগস্বীকার করার যে কত দাম, তা আমাদের মত ভবঘুরেরা বেশ জানে। তবু, তারা সেদিন যখন সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝেছিল তখন আর ইতস্ততঃ করেনি কারণ, তারা জানত যে, এই অভিযানের ওপর আমাদের নিজেদের অনেক ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা নির্ভর করছে।
তারপর সুরু হ'ল জিনিসপত্র ভাগাভাগি করার পালা। আমাদের সঙ্গে ওষুধপত্র, দরকারী সাজ-সরঞ্জাম বেশী ক'রে নেওয়া হ'ল। গরম কাপড়-চোপড়ও ত বেশী ছিল না, তাই ওরা নিজেদের গা থেকে গরম সোয়েটার কামিজ খুলে আমাদের পরতে দিলে। বনিহালের তুষার-বর্ষণ ইত্যাদি মনে ক'রে অপেক্ষাকৃত গরম কাপড়-চোপড় আমাদের সঙ্গে নেওয়ার ঠিক ক'রে ফেল্লাম। ডবল ডবল জামা গায়ে দিতে আমাদের রোয়া-ফোলান কাবুলী বেরালের মত দেখাতে লাগল।
সারাদিন এই রকম উৎকন্ঠায় কেটে গেল। এ দিকের ব্যাপার কতকটা ঠিক হ'য়ে গেলে আকাশের অবস্থা নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা সুরু হ'ল। আজকের দিনটা বড়ই খারাপ ভাবে কাটল। কালও যদি বৃষ্টি না ছাড়ে, আকাশের অবস্থা যদি এই রকমই থাকে তখন কি করা হবে? এখানে যত দেরী হ'বে ওদিকে বনিহাল-সঙ্কট পার হওয়াও তত কঠিন হ'য়ে উঠ্বে। এখানকার আকাশের অবস্থা যখন এই রকম তখন বনিহালে যে বরফ পড়্তে সুরু করেনি সে আশা করাই অন্যায়। যদি আরও দু'দিন এই রকম বৃষ্টি হতে থাকে তবে ত বরফ পড়ার জন্যে বনিহাল পার হইয়াই সুদূর-পরাহত হ'য়ে উঠ্বে। এখন আমাদের সুমুখে মাত্র এক উপায় আছে। সে হচ্ছে যেমনই আকাশের অবস্থা থাক্ না কেন, বৃষ্টি ছাড়ুক বা না ছাড়ুক, এগিয়ে যাওয়া।
সন্ধ্যার পর ঠিক হ'য়ে গেল, কাল সকালেই আমরা বনিহালের দিকে অগ্রসর হ'ব। আর যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তবে ঐ সকালেই আনন্দ ও নিরঙ্ক জম্মুর দিকে ফেরবার জন্য বেরিয়ে পড়বে।

২৮ শে অক্টোবর, বুধবার। - ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলাম আকাশের অবস্থা কেমন দেখবার জন্যে। আঃ বাঁচা গেল! আকাশ পরিষ্কার, যদিও মাঝে মাঝে এখনও মেঘের যাওয়া-আসা রয়েছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে রোদও দেখা দিয়েছে। কিন্তু আশে-পাশের পাহাড়ের চূড়া একেবারে বরফ পড়ে সাদা হ'য়ে গেছে। ঘরের চারদিকে চোখ পড়তে দেখা গেল অতদূরে কেন, যে টিলার মাথায় আমাদের ঘর তারও আশে-পাশে শ্যাওলার ওপর জায়গায় জায়গায় বরফ জমে' রয়েছে।
বেলা আটটার মধ্যে আমরা তৈরী হ'য়ে বেরিয়ে এলাম। এখান থেকে পত্নীটপ এই ১৭ মাইল বরাবর চড়াই। এপথে সাইকেল চলবে না, হেঁটে যেতে হ'বে। পত্নীটপ প্রায় ৭০০০ ফিট উঁচু। সেখান থেকে ২৪ মাইল উৎরাইয়ের পর রামবান। রামবানেই আজ রাত কাটান হবে এই রকম ঠিক করেছিলাম। ম্যাপে দেখা গেল, পত্নীটপের ১২ মাইল পর বটোথ ব'লে একটা ছোট জায়গা রয়েছে।
আর দেরী না ক'রে আমরা হাঁটতে আরম্ভ ক'রে দিলাম। পর পর দুটি বাঁক ফিরে দেখা যেতে লাগল জম্মুযাত্রীরা টিলার ওপর থেকে আমাদের দিকে চেয়ে ক্রমাগত টুপি নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে। আর একটা মোড় ফিরতেই ধরমতল একেবারে আড়াল প'ড়ে গেল। এইবার এই নির্জ্জন পথে কেবল আমরা দু'জন।
মাইলখানেক যাবার পর বাঁকের ওপারে, রাস্তার ওপর একটা টাঙ্গা দেখতে পেলাম। কাছাকাছি এসে দেখা গেল, আমাদের পরিচিত উদমপুরের ইঞ্জিনিয়র চট্টোপাধ্যায় মশায়ই এই টাঙ্গার মালিক। আমাদের সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই বললেন -
"কি! আপনারা তা হ'লে কিছুতেই ফিরলেন না?"
"হ্যাঁ। ফিরলে আপনার ওখান থেকেই ফিরতাম। আপনি এখানে?"
"আমি এসেছি। আজই আবার মোটরে উদমপুর ফিরে যাব।"
তারপর চার পাশের পাহাড়ের মাথার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, "পাহাড়ের মাথা বরফ প'ড়ে সাদা হ'য়ে গেছে দেখছেন ত? এইখানেই এই, তা হ'লে আরও ওপরে কি রকম অবস্থা বুঝতে পারছেন না? হ্যাঁ তাইত! আপনারা শুধু দু'জন যে?"
"অনেক কারণে তাদের আর আসা –"
"তা বেশ ভালই হয়েছে। আপনারাও আমার সঙ্গে ফিরে চলুন। এই দুর্য্যোগে –"
"না, মাপ করবেন। আমরা যাব ব'লেই বেরিয়েছি।"
ভদ্রলোক আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখে বোধ হয় দুঃখিত হলেন ও যখন দেখলেন যে আমাদের ফিরে যাবার কিছুমাত্র ইচ্ছা নেই তখন বল্লেন, "আপনারা যখন যাবেনই, কিছুতে বুড়োর কথা শুন্লেন না তখন এক কাজ করুন। এ চড়াইয়ে ত আপনাদের হেঁটে যেতে হচ্ছে - একটা শর্টকাট রাস্তা আছে, হাঁটা পথ, ও পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে হ'বে; তবে সুবিধে খুব। এই পথটা দিয়ে গেলেই আপনারা একেবারে পত্নীটপের মাথায় গিয়ে পড়বেন। তবে ও পথে সাইকেল ঘাড়ে ক'রে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।"
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহে কয়েকটি কুলী পাওয়া গেল। এরা পত্নীটপ অবধি আমাদের সাইকেল পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে। সেখান থেকে উৎরাই। সুতরাং পত্নীটপের পর আর বিশেষ গোলমাল নেই। যতই বৃষ্টি বাদল আসুক না কেন পত্নীটপ পৌঁছতে পারলে সেখান থেকে ২৪ মাইল উৎরাই, সাইকেলে বেশীক্ষণ লাগবে না। এই ভেবে মনটা প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল। এই অপ্রত্যাশিত সাহায্য পেয়ে এ সময়ে বড়ই উপকৃত হ'লাম।
এবার আর রাস্তা-ঘাট কিছু নেই। আগে আগে সাইকেল ঘাড়ে কুলীরা, পিছনে আমরা। সোজা খাড়াই পাহাড় ডিঙিয়ে পথ। কুলীরা মাঝে মাঝে বিশ্রাম কর্বার জন্যে থাম্তে লাগল। লটবহর শুদ্ধ সাইকেল ঘাড়ে ক'রে পাহাড় ডিঙিয়ে চলা এ দেশের লোকের পক্ষেই সম্ভব।
এই দারুণ শীতেও ক্রমাগত উঁচুতে ওঠার জন্য ঘাম বেরিয়ে গেল। প্রায় পৌনে দু'ঘন্টা এই ভাবে চলে', একটা পাহাড় ডিঙিয়ে আমরা পত্নীটপ পাহাড়ের মাথায় (৭০০০) ফিট এসে উপস্থিত হ'লাম। রাস্তাকে আবার এইখান থেকে ধরা গেল। পাহাড়ের ঠিক মাথায় দু'শ ফিট জায়গা বেশ সমতল। তার ওদিক্ থেকে রাস্তা হঠাৎ এমন ঢালুভাবে নেমে গেছে যে, সে-পথ দিয়ে সাইকেলে নামা

প্রথমটায় ত বড়ই বিপদজনক ব'লে মনে হয়। পত্নীটপ পাহাড়ের মাথার ঠিক যেখান দিয়ে রাস্তা চলে' গেছে তার আরও কয়েক শত ফিট ওপরে কাশ্মীর-জম্মুর মহারাজার ছাউনি (encamping ground) ফেল্বার প্রকাণ্ড সমতল ভূমি। মোটর চলন হবার পূর্ব্বে মহারাজারা জম্মু থেকে কাশ্মীর যাতায়াতের সময় এইসব জায়গায় সৈন্য-সামন্তদের সঙ্গে তাঁবু ফেলে থাকতেন। এই রকম ছাউনি ফেলে থাকবার জন্যে পাহাড়ের ওপর এইরকম সমতল জায়গা এই পথে আরও কয়েক জায়গায় দেখা গেল।

এইখান থেকে আমরা কুলীদের ফিরিয়ে দিয়ে আবার সাইকেলে উঠে পড়লাম। সাইকেল ঢালু পথ দিয়ে ভীষণ জোরে গড়াতে আরম্ভ করলে। ঘন ঘন বাঁকের মুখে মোড় ফেরাবার জন্য দ্রুতগতিশীল সাইকেলের বেগ কমান এক বিপদজনক কাজ। হঠাৎ ব্রেক্ (Brake) ব্যবহার করলে ত আরোহীর সাইকেল থেকে ছিটেক পড়ে' যাবার খুব বেশী সম্ভাবনা। রাস্তার গায়ে এক দিকে গগনস্পর্শী পাহাড়ের দেয়াল আর একদিকে বরাবর হাজার হাজার ফিট নীচু খাদ। সেইদিকে মাত্র তিন ফুট উঁচু পাথর রেলিংয়ের কাজ করছে। কোন রকমে সেই পাথরের বেড়া টপকালেই আর তার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়ার দফা নিশ্চিন্ত। আর এইরকম দারুণ ঢালু পথে বাঁকের মুখে মোড় ফিরবার সময় খুব বেশী ক্ষিপ্রতার প্রয়োজন হয়। এই সময় একটু অন্যমনস্ক বা ঢিলা হ'লেই হয় পাহাড়ের গায়ে বা পাথরের রেলিংয়ে সবশুদ্ধ ধাক্কা। না হ'লে সাইকেল শুদ্ধ পিছলে রেলিং টপকে নীচে পড়া অনিবার্য্য।

বটোথ (৫৬০০ ফিট) পত্নীটপের মাথা থেকে ঠিক ১২ মাইল দূর। এই ক'মাইল রাস্তা এমন ঢালু যে বটোথ আসতে আমাদের মাত্র পঁচিশ মিনিট সময় লেগেছিল। এইভাবে সাইকেল চললে রামবান আর আধঘন্টারও পথ নয়। তা হ'লে আজ রামবানে পৌঁছান সম্বন্ধে আর কোন মুস্কিল হবে না। এই রকম মনে করছি এমন সময় বটোথ পুলিস থানার সামনাসামনি দেখলাম, পথের ধারে একটা উঁচু জায়গায় দু'জন কনেষ্টেবল হাত তুলে' আমাদের থামবার জন্য ইঙ্গিত করছে। অগত্যা নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক দূর থেকে আস্তে আস্তে ব্রেক্ কসে' গাড়ী থামিয়ে ফেল্লাম। জম্মুর মত এখানেও আবার সেই ধরণের জিজ্ঞাসাপড়া শেষ হ'য়ে গেলে আবার ঢালু পথে গাড়ী চালিয়ে দিলাম। রামবানের আগেই চেনাব নদী। চেনাব পার হ'য়ে রামবান (২৫০০ ফিট) পৌঁছলাম ঠিক সন্ধ্যার আগেই। পুলের ওপর দিয়ে পার হ'বার জন্য আমাদের কয়েক আনা শুল্ক দিতে হ'ল।

উদমপুরে রামবানের ইঞ্জিনিয়র পণ্ডিত জীরালাল সোফরীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ইনি আগে থেকেই আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে রেখেছিলেন। আমরা সেইখানেই রাত্রের মত উঠে পড়লাম। তা ছাড়া আর-একটা দরকারী কাজ ছিল - সে হচ্ছে বনিহাল চটী থেকে বনিহাল পাস সম্বন্ধে একটা পায়ে হাঁটা-পথের সন্ধান নেওয়া। বনিহাল থেকে রাস্তায় এর দূরত্ব পড়ে ঠিক কুড়ি মাইল। বরাবর খাড়া চড়াই। সে পথে সাইকেল চলবে না হাঁটতে হ'বে। কুড়ি মাইল হেঁটে চলা সারা দিনের ধাক্কা। বনিহাল-পাস থেকে আরও বার মাইল নীচে গেলে তবে ওপর মুণ্ডা। ওপর মুণ্ডার আগে এই ৩২ মাইলের মধ্যে মাথা গোঁজবার মত কোনো জায়গা নেই। কিন্তু বনিহালের কয়েক মাইল পর টাকিয়া থেকে ধরমতল পত্নীটপের মত আর-একটা পায়ে-হাঁটা পথ আছে। এই পায়ে হাঁটা পথে গিরিসঙ্কট মাত্র দু'মাইল। তবে এই দু'মাইল বরাবর সাইকেল ঘাড়ে ক'রে ওঠা ভিন্ন কোন উপায় নেই। ওদিকে কুড়ি মাইল পথ হেঁটে পাসের ওপর পৌঁছতেই প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে যাবে। তারপর আর বার মাইল নীচে গেলে তবে আশ্রয় পাবার মত জায়গা। যদি এই পথ ঠিক সময়ের মধ্যে অতিক্রম করতে না পারি তবে ত রাত্রে সেইখানেই বরফের মধ্যে জমে থাকতে হবে। এই সব ভেবে আমরা অধিক কষ্টকর কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম দূর, এই হাঁটা পথের সাহায্যে গিরিসঙ্কট পার হ'ব এই রকম স্থির করেছিলাম। এই শর্টকাট রাস্তার সন্ধান জম্মুর আশুবাবু আমাদের দিয়েছিলেন।

কিন্তু এই পথ দিয়ে যাওয়া স্থানীয় কুলীদের সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়। প্রথমত পদে পদে রাস্তা হারাবার সম্ভাবনা। তারপর এই দু'মাইল খাড়া চড়াই পাহাড়ের গা দিয়ে, সাইকেল কাঁধে ক'রে ওঠা সেও আর এক বিষম ব্যাপার। এখানে লোক যোগাড় করা বিদেশীর পক্ষে শক্ত ব্যাপার। কাজে কাজেই ইঞ্জিনিয়র সোফরী সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা হোক্ ঠিক করা যাবে এই মনে ক'রেই সেইখানে উঠে পড়েছিলাম।

সোফরী সাহেব টাকিয়ার সাব্-ওভারসিয়ারের কাছে কুলী ঠিক করার জন্যে আমাদের একখানা চিঠি দিলেন। পথ সম্বন্ধে আরও অনেক খোঁজ-খবর এঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল। আজকের দৌড় মাত্র ৪৪ মাইলের, কিন্তু কতকটা পথ কুলীর ঘাড়ে সাইকেল আসার জন্য মিটারে উঠেছে ১৫১০ মাইল।

২৯শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার। - বেলা সাতটা - তখনও কুয়াশায় চারদিক্ অন্ধকার, আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আজকে রাত্রিবাস হ'বে টাকিয়াতে। আজকের এই ত্রিশ মাইল পথ বরাবর চড়াই। হাঁটা ভিন্ন উপায় নেই।

এই পাহাড়ে পথের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। চার পাশেই পাহাড় কেবল মাথার ওপরে আকাশটুকু ফাঁক। তবে এ পথের জলের বন্দোবস্ত আছে। ক্রমাগত চড়াই উঠতে উঠতে মোটরে জল বদলাবার জন্য মাঝে মাঝে ঝর্ণা থেকে, জল বেঁধে রাখা হয়েছে। সেইসব জায়গা থেকে মাঝে মাঝে জল খেতে খেতে আমরা অগ্রসর হ'তে লাগলাম। সাইকেলকে টানতে টানতে বরাবর চড়াই উঠতে পরিশ্রম বড় কম হয় না। এই দারুণ শীতেও ঘন ঘন জল খেতে হচ্ছিল।

সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর বেলা প্রায় চারটার সময় বনিহাল চটীতে (৬০০০ ফিট) পৌঁছলাম। পথে রামসু ব'লে একটা চটীতে কিছু খেয়েছিলাম। এ পথে দিগদল ব'লে আর-একটা চটী আছে।

বনিহাল বেশ বড় চটী। পীরপাঞ্জালের নীচেই বনিহাল। এই পীরপাঞ্জাল শ্রেণীর একটা চূড়ার ওপর বনিহাল গিরিসঙ্কট।

বনিহাল চটী বেশ সমতল জায়গার ওপর। এখান থেকে আর চার মাইল দূরে টাকিয়া। প্রায় সাড়ে তিন মাইল পর রাস্তার ওপর একটি পাহাড়ে নদীর সাঁকো; সেই সাঁকোর পাশ থেকে পাহাড়ের গা-বেয়ে টাকিয়ার হাঁটা পথ। এইখান থেকে আমরা লটবহর শুদ্ধ সাইকেল কাঁধে করে' টাকিয়া পৌঁছবার জন্য পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগলাম। রাস্তা থেকেই পাহাড়ের গায়ে টাকিয়া দেখা যাচ্ছিল, বোধ হয় আধ মাইলও নয়। কিন্তু এই পথটুকু আসতে আধ ঘন্টারও বেশী লেগে গেল।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একটি সাব্-ওভারসিয়ার ও কয়েকটি কুলি নিয়ে এই বসতি। এদের রসদপত্র সব বনিহাল থেকে আনতে হয়। আমরা সাব্-ওভারসিয়ার মুকুন্দ সিংকে ইঞ্জিনিয়র সোফরি সাহেবের চিঠি দিলাম ও আমাদের অভিপ্রায় সব বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে বল্লাম। ইনি অতিশয় ভদ্রলোক। বল্লেন, আপনারা যখন এতদূর আসতে পেরেছেন তখন আমার সাহায্যের অভাবে যে, আপনাদের এই অভিযান ব্যর্থ হবে না সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন। বলা বাহুল্য যে, অনেক দিন পর এরকম উৎসাহপূর্ণ কথা শুনে মনটা চাঙ্গা হ'য়ে উঠেছিল। আজকের পথে মাইল তিন চার সাইকেল করা গিয়েছিল বাকী সবই হেঁটে আসতে হয়েছে। দৌড় মোট ৩০ মাইলের - মিটার ১৫৪০।

৩০শে অক্টোবর, শুক্রবার। - খুব সকালে আমরা প্রস্তুত হ'য়ে পড়লাম। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের অনুগ্রহে দেখি কুলী হাজির। ঘরের সাম্নে জায়গায় জায়গায় শিশির জমে সাদা হ'য়ে রয়েছে। আশপাশের পাহাড়ের গা একেবারে সাদা। কাল সব কাপড়-চোপড় শুদ্ধ কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালিয়েও কাঁপতে হয়েছে।

রওনা হলাম ন'টার পরেই। তখনও বেশ রোদ ওঠেনি। সাইকেল কাঁধে করে' চার জন কুলী আমাদের আগে আগে চলল। এ পথের আর কোন রকম বিশেষত্ব নেই; কেবল খাড়া চড়াই, হাঁটা পথ। মাঝে মাঝে একটা পাতলা মেঘের জাল আমাদের ঢেকে ফেলছিল। মনে হচ্ছিল যেন কাপড়-চোপড় ভিজে গেল। পাহাড়ের গায়ে গাছপালা কিছু নেই কেবল বড় বড় ধূসর রংয়ের শ্যাওলার চাপ। সেইসব শ্যাওলার ওপর জায়গায় জায়গায় তুষার প'ড়ে সাদা হ'য়ে রয়েছে। কুলীরা মাঝে মাঝে বিশ্রাম করার জন্য দাঁড়াতে লাগল। এই দারুণ শীতেও ভীষণ পরিশ্রম করার জন্য ঘাম হ'তে লাগল। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা আর ভেতরে কাপড়-চোপড় ঘামে ভিজে জল। বরাবর হাঁটতে পার্লে একরকম ভাল, কিন্তু একটু দাঁড়ালেই ভেতরে ভেজা জামার জন্য হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি লাগিয়ে দেয়। অথচ না থেমে ক্রমাগত এই রকম চড়াই ওঠার চেষ্টা কর্লে নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে, মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম কর্তে থাকে। এই চড়াইটার খাড়াই খুব বেশী, ১৫ মাইল পথ ঠিক ২ মাইলে এসেছে।

প্রায় তিন ঘন্টা এইরকম পরিশ্রমের পর আমরা বনিহাল-সঙ্কটের কাছাকাছি এসে পড়লাম। মাথার কয়েক শত ফিট ওপরেই একটা পাহাড়ের চূড়ার দিকে দেখিয়ে কুলীরা ব'লে দিলে ঐ আমাদের গন্তব্য স্থান। বিস্ময় পুলকে মনটা দুলে উঠল। কারণ ঐখান থেকে বরাবর ঢালু পথ। ঐখানে পৌঁছলেই শ্রীনগর পৌঁছান সহজ হ'য়ে আসবে।

আরো কয়েক মিনিট পর আমরা একবারে বনিহাল-সঙ্কটের সামনে (১০০০০ ফুট) রাস্তার ওপর গিয়ে পড়লাম। সমুখেই সুড়ঙ্গ; ভিতর একেবারে অন্ধকার। সেই সুড়ঙ্গ পার হ'য়ে ওদিকে যেতে হ'বে। এইখান থেকে আমরা কুলীদের বিদায় দিলাম। এদের সাহায্য না পেলে এত শীঘ্র কাজ উদ্ধার হ'ত না। বেচারারা এত সরল ও নিরীহ প্রকৃতির যে, যাবার সময় আমাদের কাছ থেকে কিছু বকশিসও চাইলে না। যথা সাধ্য তাদের সন্তুষ্ট ক'রে তাদের ফিরে যেতে ব'লে দিলাম। সাময়িক সাহায্যের জন্য এদের কাছে আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব।

বেলা ১২টা। ক' মিনিট দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বল্তেই ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপুনি লাগিয়ে দিয়েছে। ডায়েরীর পাতায় দরকারী কয়েকটি কথা লেখার জন্য কলম ধরা দায়। হাত পায়ের আঙুল, নাকের ডগা চিন্ চিন্ করতে সুরু ক'রে দিয়েছে। ভেতরের কাপড়-চোপড় ঘামে ভিজে একেবারে ঠাণ্ডা কন্ কন্ কর্ছে। মণি অনেক চেষ্টা ক'রেও খাতার পাতায় কয়েকটি আঁচড় কাটতে পারলে না। তারপর আমার পালা। খানিকক্ষণ চেষ্টার পর নিজের হাতের লেখা নিজেই পড়তে পারলাম না। এমন কি শ্রীনগরে পৌঁছে সে লেখা বাংলা কি ইংরেজী সেই গবেষণা করতে হয়েছিল।

এইবার আমরা চলতে সুরু করলাম। অন্ধকার সুড়ঙ্গ চারদিক্ ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে। এক এক জায়গায় ওপর থেকে টপ টপ ক'রে জল পড়ছে। নিস্তব্ধ মিশকালো অন্ধকারের ভেতর আমরা দু'জন। কেবল আমাদের সাইকেলের ফ্রি হুইলের টিক্ টিক্ আওয়াজ। ক্রমশঃ সামনে থেকে ধোঁয়া ভরা ক্ষীণ আলো দেখতে পেলাম। বুঝলাম ঐখানে সুড়ঙ্গ শেষ হ'য়েছে। আরো দু'এক মিনিট পরেই আমরা একবারে সুড়ঙ্গ পার হ'য়ে রাস্তার ওপর এসে পড়লাম। সুড়ঙ্গের ওপরে খোদাই ক'রে লেখা A.D. 1920|660 ft.। এদিকে দৃশ্য একেবারে বদলে গেছে। চারদিক্ অন্ধকার; দশ গজ দূরে নজর চলে না। পাহাড়ের রং বরফে একবারে সাদা। পথের ওপর প্রায় চার ইঞ্চি তুষার পড়ে 'রয়েচে। আর ঠাণ্ডা যেন ওদিকের চেয়ে তিন গুণ বেশী। এই পীরপাঞ্জাল শ্রেণীর ওদিকে জম্মু প্রদেশ ও এদিকে কাশ্মীর প্রদেশ।

সঙ্গে কয়েকটি গরম কাপড়ের পট্টি ছিল। ঠাণ্ডার চোটে সেইগুলি এখন পা থেকে কোমর অবধি জড়িয়ে ফেললাম। শীতের জন্য আঙুল অবশ। যতই আমরা এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে লাগলাম ততই হাড়ের মধ্যে কন্ কন্ বোধ কর্তে লাগলাম। এখন কি করে' অগ্রসর হওয়া যায় সেই হ'ল সমস্যা। এই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ঢালু পথে বরাবর পনের কুড়ি মাইল পথ নামা বড় মুস্কিলের কথা। তুষার পাতের জন্য রাস্তা পিছল; যদি কোনরকমে দশ হাজার ফুট ওপর থেকে সাইকেলের চাকা পিছলায় তবে কোথায় কত নীচে ছিটকে পড়তে হ'বে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সুতরাং মনে করলাম হেঁটেই চলা যাক্ - কুয়াসা কাটলে সাইকেলে চড়া যাবে। কিন্তু প্রায় মাইল খানেক হাঁটার পরও যখন কুয়াসা কিছুমাত্র কমল না, চারদিক্ সেই রকমই অন্ধকার তখন বাধ্য হ'য়ে সাইকেলে উঠতে হ'ল। কারণ, তখন ঠান্ডার চোটে অবস্থা কাহিল হ'য়ে এসেছে। মুখ, হাত আর মাথার মধ্যে চিন্ চিন্ করছে আর পায়ের তলা অসাড়।

ঘন অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আগে পিছনে আমাদের সাইকেল ছুটে চলেছে। ঢালু রাস্তার জন্য সাইকেলের গতির বেগ ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্চে। প্রাণপণ ব্রেক কসেও তার বেগ কমান যায় না। টায়ারের পাশ দিয়ে গুড়িগুড়ি তুষার ছিটকে চোখে মুখে লাগছে। কানের পাশ দিয়ে ঝড়ের মত হাওয়ার গর্জ্জন। মাঝে মাঝে আমরা চীৎকার ক'রে পরস্পরের খবর নিচ্চি। আবার ঘন ঘন বাঁকের জন্য এক-এক জায়গা একবারে নিস্তব্ধ, বাতাসের লেশমাত্র নেই। সেখানে অন্ধকারের মধ্যে কেবল মিটারের ক্রমাগত টিক টিক শব্দ।

দশ মাইল পরের ওপর-মুণ্ডার বাংলো এখন আমাদের লক্ষ্য। ক্রমাগত ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর যেন অসাড় হ'য়ে গেল। প্রায় ন'মাইল এই ভাবে চলার পর কুয়াশা যেন কিছু হাল্কা হ'য়ে গেল। অস্পষ্ট আলোর ভেতর দিয়ে ক্রমশঃ পাহাড়ের গায়ের একখানি ছোট ঘর দেখা গেল। মণি চীৎকার করে ব'লে উঠল, "ওপর-মুণ্ডার বাংলো"।

এই পথটায় একটাও জন-প্রাণী দেখতে পেলাম না। তাই বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, ঐ বাংলোর মধ্যে আবার লোকজন আছে। যাই হোক এখানে আগুন জ্বালাবার জন্য যথেষ্ট কাঠ পাওয়া গেল। খানিকক্ষণ আগুনের পাশে বসে' অনেকটা সুস্থ হ'য়ে উঠলাম। তারপর গরম গরম কয়েক পেয়ালা চা। এ রকম সময় এই জায়গায় যে পয়সার বিনিময়ে সাহায্য পাব তা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কাজে-কাজেই এই সাময়িক সুবিধা ও সাহায্য পেয়ে নিজেদের খুব সৌভাগ্যবান ভেবে মনে মনে তারিফ করতে লাগলাম।

বেলা প্রায় দেড়টা। কিন্তু বাইরে এসে দেখলে মনে হয় বুঝি এই সবে ভোর হচ্চে। আবছা কুয়াশার ভেতর দিয়ে সরু রাস্তা ক্রমাগতই নীচের দিকে নেমে গেছে। এখান থেকে শ্রীনগরের দূরত্ব মোট ৫৯ মাইল। আরো খানিকটা উৎরাই, তার পর থেকে সমান রাস্তা সুরু হ'বে। বেলা দেড়টা, সুতরাং চেষ্টা করলে আজই শ্রীনগর পৌঁছান যাবে এই ভেবে আবার বেরিয়ে পড়লাম।

আকাশ পরিষ্কার। ঠিক তিন মাইল আসার পর একটা প্রকাণ্ড বাঁকের ওদিকে ঘুরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন মন্তরের চোটে চার দিকের

পাষাণ প্রাচীর অদৃশ্য হ'য়ে গেল। পায়ের নীচের দিগন্ত বিস্তৃত চীর ও পাইনের শ্রেণীতে ভরা সবুজ শস্যশ্যামল সমতল ভূমির মাঝে রূপালি সূতার মতই সরু নদী খামখেয়ালী ভাবে ঘুরে বেড়িয়েচে। এর সীমানা নির্দ্দেশ করেছে দিকচক্রবালের গায়ে বরফ-মাখা বিরাট্ পর্ব্বতশ্রেণী। এইসব অনন্ত-তুষারাবৃত পাহাড়ের গায়ে জায়গায় জায়গায়, সূর্য্যের আলো যে কত বিভিন্ন রকমের রং বেরঙের সৃষ্টি করেছে তার ইয়ত্তা নেই। পীরপাঞ্জাল শ্রেণী থেকে বিশ্ববিখ্যাত কাশ্মীর উপত্যকাকে এই রকমই দেখায়।

এর পরেই নীচু-মুণ্ডা (Lower Moonda) পার হ'য়ে কোয়াজিগন্দে এসে পড়লাম। এইখান থেকে সুন্দর, দুপাশে চীর গাছের সারি দেওয়া সমান রাস্তা সুরু হ'ল। অনেক দিন পর পাহাড়ে পথের কাছ থেকে পরিত্রান পেয়ে আমরা খুব শীঘ্রই খানাবলে এসে পড়লাম।

বনিহালের পর খানাবলই বেশ বড় চটী। এখানে অনেক রকম জিনিস পত্র মেলে। ডাক বাংলো, সরাই ইত্যাদি আছে। জম্মু থেকে যে পথ দিয়ে আমরা এতদিন এলাম সে-পথ এখানে এসে শেষ হ'য়ে গেছে। সে রাস্তার নাম বনিহাল কার্ট রোড (Banihal Cart Road)। এবার খানাবল থেকে যে পথ দিয়ে আমাদের শ্রীনগর যেতে হ'বে তার নাম শ্রীনগর অনন্ত নাগ রোড্। খানাবল এই রাস্তার প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়। এখান থেকে শ্রীনগর মোট ৩৫ মাইল দূর। রাস্তা ভাল, বেলা মোটে ৩টা; সুতরাং অনেক দিন পর আজ নিশ্চিন্ত মনে খাওয়া-দাওয়া শেষ করা গেল।

রওনা হ'লাম বেলা চারটার সময়। বাকী পঁয়ত্রিশ মাইল রাস্তা যে কি ক'রে চ'লে এসেছিলাম তার কিছু খেয়ালই নেই। পথের ওপরেই পড়ল অবন্তীপুরার ধ্বংসাবশেষ। মাঝে মাঝে ছোটখাট গ্রামও দেখা যেতে লাগ্ল। এইসব ছাড়িয়ে আমরা বিজলী-বাতি-ওয়ালা পামপুর সহরে উপস্থিত হ'লাম। পামপুর জাফরাণের চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। রাস্তা থেকে কিছু দূরে জাফরাণের চাষও দেখা যেতে লাগ্ল। আর মাইল দশের মধ্যেই শ্রীনগর। ভাব্লাম অল্পক্ষণের মধ্যেই শ্রীনগরে উপস্থিত হ'তে পারব। কিন্তু আমাদের শেষ পর্য্যন্ত একটা-না-একটা মুস্কিলে পড়তে হ'বে বোধ হয় এই রকম কিছু কথা ছিল। সেইজন্য পামপুরের পরই হঠাৎ ২নং ষ্ট্যান্ডার্ড সাইকেলের ফ্রি হুইল (Free wheel) বিগ্ড়ে গিয়ে সাম্নে পিছনে দু'দিকেই নির্ব্বিকারভাবে ঘুর্তে সুরু ক'রে দিলে। মনে কর্লাম নিশ্চয়ই ভেতরের স্প্রিং কেটে এই অবস্থা হ'য়েছে। সেই জন্য এই অন্ধকারে আর সমস্ত খোলাখুলি করার হাঙ্গাম না ক'রে এই সাত আট মাইল হেঁটেই চ'লে যাওয়া স্থির কর্লাম। কিন্তু পর দিন শ্রীনগরে গিয়ে মেরামত করার জন্য সমস্ত খুলে দেখা গেল ভিতরে স্প্রিং ঠিকই আছে। ঠাণ্ডার চোটে ফ্রি হুইলের স্প্রিং ভেতরের ভেসলিনের সঙ্গে জমে' পাথরের মত শক্ত হ'য়ে রয়েছে। আর সেই জমাট ভেসলিনের মধ্যে স্প্রিং আটকে যাওয়ার দরুণ কোন কাজ করতে না পারায় এই বিপত্তি।

সাইকেলে শ্রীনগর প্রবেশ আর আমাদের দ্বারা হ'য়ে উঠল না। পাহাড়ের চূড়ার ওপরকার মন্দিরের তীব্র বিজলী আলো জানিয়ে দিলে আমরা সহরের খুব কাছে এসে পড়েছি। হাঁটেত হাঁটেত রাত প্রায় ন'টার সময় সহরের এলাকার মধ্যে প্রবেশ করলাম। এরই খানিকক্ষণ পরে সহরের এক প্রান্তে একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাংলোর সামনে আমাদের ঘন ঘন ঘন্টাধ্বনি শুনে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বেরিয়ে এসে বললেন -

"ওঃ আপনারা? এতদিন পরে? আমি রোজই আপনাদের expect করছি। আমার ছেলে এই সেদিনও আপনাদের কথা লিখেছে। তা আপনাদের আর দু'জন?"

বল্লাম - "অনেক কারণে সকলেরই আর আসা সম্ভব - "।

কাশ্মীরের চিফ্ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (Chief Electrical Engineer) শ্রীযুত ললিতচন্দ্র বসু মহাশয়ের সৌজন্যের বিষয় আর নূতন ক'রে লেখার কোন প্রয়োজন নেই। উত্তর ভারতে এঁর অতিথিপরায়ণতার কথা না জানে এরকম প্রবাসী বাঙালী অতি বিরল। ঘন্টা-খানেকের মধ্যেই আমরা যথেষ্ট আরামের রাজ্যে এসে পড়লাম –। কালকের রাতের সঙ্গে আজ কত তফাৎ। এই দিনের মত আরামে আর কখনও ঘুমিয়েছি কি না জানি না। আজকের দৌড় ৭২ মাইলের - মিটারে উঠেচে ১৬১২ মাইল।

শেষ

শ্রীনগরে তিন দিন কাটিয়ে ঝেলাম ভ্যালী রোড্ দিয়ে মারী পাহাড় (প্রায় ৭০০০ ফিট) পার হ'য়ে রাওলপিণ্ডি। সেখান থেকে দিল্লী আগ্রা হ'য়ে মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার ভেতর দিয়ে সাইকেল আমাদের কলকাতা পৌঁছে দিয়েছিল ৩১শে ডিসেম্বর। সময়াভাব বশতঃ বাকী অংশটুকু আর এখন প্রকাশ করা সম্ভবপর হ'য়ে উঠল না। কলকাতা থেকে বার হ'য়ে এই পথ দিয়ে আবার কলকাতায় ফিরে আসার জন্য আমাদের মোট ৪০১৪ মাইল পথ অতিক্রম করতে হ'য়েছিল।

সারা পথেই আমরা প্রবাসী বাঙালী অবাঙালীদের কাছ থেকে যথেষ্ট সহানুভূতি ও উপকার পেয়ে এসেছিলাম। তাঁদের সাময়িক সাহায্য ও সময়োচিত পরামর্শ না পেলে এই ভ্রমণ যে সুচারুভাবে শেষ করা যেত না, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। জম্মুর অধ্যাপক শ্রীযুত আশুতোষ বন্দোপাধ্যায়, কাশ্মীরের ইঞ্জিনিয়র-দ্বয় শ্রীযুত পতিরাম চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত জীরালাল সোফরী, সাব্-ওভারসিয়র শ্রীযুত মুকুন্দ সিং ও দিল্লীর অধ্যাপক শ্রীযুত আশুতোষ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণের কাছে এই 'অভিযান' বিশেষভাবে উপকৃত। এঁদের ও অপরাপর আর সব ভদ্রলোকের কাছে আমরা সকলে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। এই ভ্রমণ-কাহিনীর কথা মনে হ'লেই রবিবাবুর দু'লাইন মনে পড়ে যায় -

কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই।
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।।

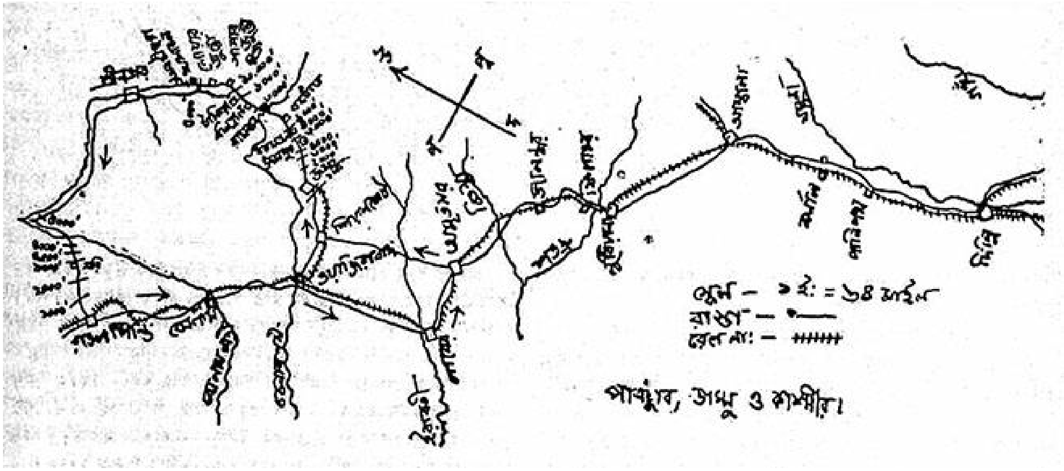

- সমাপ্ত -

(প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩৩ সংখ্যা)

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ হিতেশরঞ্জন সান্যাল মেমোরিয়াল আর্কাইভ

[মূলের বানান ও বিন্যাস অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। - সম্পাদক]

কেমন লাগল : - select -
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ওই বাংলার মায়াভরা পথে

নীলিমা ঘোষ

পাসপোর্ট আগে থেকে করাই ছিল কিন্তু ব্যবহারের সুযোগ হয়ে ওঠেনি। ঘরের পাশেই বিদেশ। তার ওপর বাঙালিদের বিদেশ। শেষমেষ ঘোরার একটা ছক কষেই ফেললাম। খুব কৌতূহল ছিল। ঘুরে যা দেখলাম তা অভাবনীয়। অবিভক্ত বাংলার, প্রাচীন বাংলার মন্দির, বৌদ্ধমঠ আমার ধ্যান-ধারণাকে একটা নতুন রূপ দিল। সেই সঙ্গে চারপাশের নাগরিকদের আন্তরিকতা। বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে ভিসা সংগ্রহ করে কলকাতা স্টেশনে সোনালী ব্যাংক কাউন্টার থেকে ভারতীয় টাকার বিনিময়ে কিছু বাংলাদেশি টাকা নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে বন্ধন এক্সপ্রেসে চেপে বসলাম। দিনটা দুর্গাপুজোর পঞ্চমী। ইমিগ্রেশন চেকিং-এর লাইনে দাঁড়িয়ে যথারীতি কাজকর্ম মিটিয়ে ট্রেনে উঠলাম। প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ খুলনা পৌঁছিয়ে পরিকল্পনামতো মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মভিটে দর্শন দিয়ে আমার ভ্রমণ আরম্ভ হল। প্ল্যাটফর্মের এক ভদ্রলোককে সাগরদাঁড়ি কিভাবে যাব জিজ্ঞেস করাতে উনি বললেন 'আপনি প্ল্যাটফর্মের বাইরে বেরিয়ে অটোতে চেপে সোনাডাঙা (যতদূর মনে পড়ছে জায়গাটার নাম সোনাডাঙা-ই হবে) যাবেন। সেখান থেকে সাগরদাঁড়ির সাইকেল ভ্যান কিংবা অটো পেয়ে যাবেন।' ধন্যবাদ জানিয়ে অটোতে চেপে বসলাম।

মাইকেল-এর বাসগৃহের সামনে টিকিট কাউন্টার আছে। বাংলাদেশ সরকার বাসগৃহটি সংস্কার করেছেন। পঞ্চমীর দিন গিয়েছি, তাই ঠাকুরদালানে প্রতিমা সাজানো, আলো লাগানো হচ্ছিল। ঘরগুলিতে তখনকার দিনের ব্যবহৃত আসবাবপত্র, গ্রামাফোন, লোহার সিন্দুক ইত্যাদি সাজানো আছে। মধুসূদনের স্বহস্তে লিখিত কিছু কথা বাঁধানো দেখলাম। একটি বংশলতিকাও বাঁধানো আছে। এক ভদ্রমহিলা ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিলেন। উনি বাসভবনের তত্ত্বাবধানে আছেন বললেন। একতলায় একটি ছোট ঘরে লাইব্রেরি রয়েছে। বাইরে বেরিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় তুলসী মঞ্চের কাছে একটা ফলকে লেখা "কবির প্রসূতি স্থল"। বাড়ির ভেতরের বারান্দায় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো চেয়ারে বসে আছেন। ভদ্রমহিলা পরিচয় করিয়ে দিলেন, উনি মধুসূদনের কাকার বংশধর। সরকার বাড়িটি অধিগ্রহণ করায় এখন অন্যত্র থাকেন। ভদ্রমহিলা বললেন "বাড়ির বাইরে কিছুটা গেলে রাস্তার ধারে একটা বাদাম গাছ দেখবেন। তার নিচে মাইকেল কিছুদিন হেনরিয়েটা ও পুত্র অ্যালবার্টসহ থেকেছিলেন।" খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে বিলেত থেকে ফেরায় বাড়ি ঢোকার অনুমতি পাননি। সামনেই কপোতাক্ষ নদী, তার বাঁধানো ঘাটে নৌকা লেগে রয়েছে। পাকা রাস্তার অপরদিকে ঘেরা বাগানের মধ্যে মধুসূদনের মূর্তি রয়েছে।

সন্ধে নেমে এসেছে, আমি কেশবপুরের হোটেলে থাকব সে রাত্রিটা। ভোরে যশোর চলে যাব। সেখান থেকে কুষ্ঠিয়া যাওয়ার বাস ছাড়ে। কেশবপুরের হোটেলে রাত্রে থানা থেকে এক ভদ্রলোক এসে পাসপোর্ট দেখতে চাইলেন। হোটেলে আবাসিকদের একজন বয়স্কা মহিলা দেখাশোনা করেন। তাঁকে দরকার হলে ডাকতে বলে গেলেন।
পরদিন সকল আটটার মধ্যে যশোর যাওয়ার বাসে উঠে পড়লাম। যশোর থেকে আবার বাসে কুষ্ঠিয়া। বাসস্ট্যান্ড থেকে রিকশা নিয়ে কুষ্ঠিয়া বাজারে এক হোটেলে উঠলাম। তখন বারোটা বেজে গিয়েছে। ঘরে ঢুকে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। খুলে দেখি হোটেলের রিসেপশন কাউন্টারের ছেলেটির সঙ্গে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। আমি ভারত থেকে এসেছি শুনে ওনার হোটেলে খাওয়াবার জন্য নিতে এসেছেন। বললাম, আপনি যান, আমি তৈরি হয়ে নিয়ে একটু বাদে যাচ্ছি। খানিক বাদে হোটেলের বাইরে এসে দেখি উনি দাঁড়িয়ে আছেন নিয়ে যাবেন বলে।
নিরামিষ পদই খেলাম, দামও সাধ্যের মধ্যে। ওনার মা ও একজন অল্পবয়সি মহিলা খুব যত্ন করে খাওয়ালেন। কিছুক্ষণ আলাপের পর আমি বিদায় নিলাম। এবার লালন ফকিরের মাজার যাব। খুব কাছেই। ছেউড়িয়া। ওনারা রাস্তা বলে দিলেন। মলম শা ফকির পালক পিতা। মতিজান ফকিরানি পালকমাতা। লালন ফকির, স্ত্রী বিশাখা ফকিরানির সমাধি রয়েছে ঘর ও তৎসংলগ্ন ঘেরা বারান্দাতে ও বাইরের উন্মুক্ত স্থানে। সেখানে আরও কিছু সংখ্যক পরিচিত ব্যক্তিরও সমাধি রয়েছে। ছিমছাম পরিবেশ। সেদিন জনসমাগম একটু বেশিই হয়েছিল। মাজারের পাশেই লালন আকাদেমি। একতলায় সভাগৃহ। চারধার উন্মুক্ত। গান হচ্ছে।

যে কেউ যখন খুশি আসছে আবার উঠেও যাচ্ছে। অন্যত্র কেউ কেউ চাদর বিছিয়ে আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করছেন। দোতলায় লাইব্রেরি। আকাদেমিতে সঙ্গীতচর্চাও হয়। শুনলাম কিছুদিন বাদে লালনমেলাও হবে। পথে বেরিয়ে হোটেলের নামটা মনে করতে পারছিলাম না। এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাব। হোটেলের নাম মনে না পড়ায় উনি কাছেপিঠে উল্লেখযোগ্য কিছু আছে কি না জানতে চাইলেন। একটা মিষ্টির দোকানের নাম করলাম। মিষ্টির দোকানটা আসতেই হোটেলটা চিনতে পারলাম। ভদ্রলোক আমার সঙ্গে অটোতে উঠেছিলেন, বললেন, আমি কাছেই যাব। ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে পড়লাম। এইভাবে পরবর্তী সময়ে পথেঘাটে অনেকেই নানা ভাবে সহযোগিতা করেছেন। মিষ্টির দোকান থেকে রসগোল্লা আর অন্য দোকান থেকে রুটি তরকারি কিনে হোটেলে ফিরে এলাম। রসগোল্লা খুবই সুস্বাদু ছিল।
পরেরদিন সকল সাতটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম। আজ যাব শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি। কুষ্ঠিয়া শহরের পাশেই গড়াই নদী। একটা রিকশা নিয়ে ঘোড়াঘাটে গেলাম। ঘাটে তিন টাকা দিতে হল। নৌকা ফেরিতে পারাপারের ভাড়া আলাদা। সে সময় বৃষ্টির ফলে নদীর পাড় কর্দমাক্ত। একটা নৌকা তখন ঘাটে ভিড়ছে। নৌকায় সকলে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাটে যিনি ভাড়া নিচ্ছিলেন বললেন, এই কাদাপথ দিয়ে পাড়ে যেতে সময় কম লাগবে বটে, তবে আপনার নদী না পেরিয়ে সাইকেল ভ্যানে ব্রিজ দিয়ে যাওয়াই ভাল। একটা সাইকেল ভ্যান দাঁড়িয়ে ছিল। ভদ্রলোক ভ্যানচালককে ডেকে বললেন, এনাকে নিয়ে যা কুঠিবাড়ি। পদ্মানদী আর তার চারপাশ ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিবি। আমাকে বললেন লোকালে গেলে অর্থাৎ অন্য সহযাত্রী থাকলে চল্লিশ টাকা কিন্তু আপনি একা রিজার্ভে যাচ্ছেন বলে একশো টাকা দেবেন।
সাইকেল ভ্যানে যেতে যেতে ভ্যানচালকের সঙ্গে নানা কথা হচ্ছিল। পাকা রাস্তা অতি মনোরম। নতুন ব্রিজের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় বাঁদিকে ব্রিটিশ আমলের রেলব্রিজ চোখে পড়ল। কথা প্রসঙ্গে বললাম কয়াগ্রামে বাঘাযতীনের জন্মস্থান আর লাহানি গ্রামে 'বিষাদসিন্ধু'র লেখক মীর মুশারফ হোসেনের বাড়ি কুঠিবাড়ি যাওয়ার পথেই তো পড়ে? ভ্যানচালক বলল, আগে বললেন না কেন, ঘুরিয়ে আনতাম। কুঠিবাড়িতে ঢোকার আগে পাশের রাস্তা দিয়ে আমাকে সে পদ্মানদী দেখাতে নিয়ে গেল। ভাবলাম, এই নদী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কত সাহিত্যকীর্তির সাক্ষী হয়ে আছে। দূরে ঘাটে নৌকা ভিড়ে আছে, মালপত্র ওঠানামা হচ্ছে।

কুঠিবাড়িতে যখন পৌছলাম, তখন গেট খুলে গিয়েছে। টিকিট কেটে ভেতরে বাগানের মধ্য দিয়ে কুঠিবাড়ি যাওয়ার বাঁধানো পথে এসে পৌঁছলাম। অত্যন্ত সাজানো গোছানো মনোরম পরিবেশ। ঘরে ঢুকে মনে হল এককালে রবিঠাকুর ঘরগুলি ব্যবহার করেছিলেন। দুটি পালকি আছে, একটি বড় ষোলো বেয়ারার বহনযোগ্য, অপরটি আট বেয়ারার। কবি যে বজরা ব্যবহার করতেন তার ছবি আছে। ঘরে ঘরে দেওয়ালে কোথাও ওনার কবিতার পাণ্ডুলিপি, আবার কোথাও নিজ হাতে আঁকা অনেক স্কেচ ও রয়েছে। আর আছে কিছু চিঠিপত্র ও পারিবারিক ছবি। ঘরে মৃদু রবীন্দ্রসঙ্গীত বেজে চলেছে। বারান্দায় একটা নৌকা রয়েছে। সমস্ত কিছুই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত। দোতলা থেকে নেমে এলাম। বাড়ির পাশে বাগান। আমগাছ, দোলনা, ছোটোরা দৌড়াদৌড়ি করছে। পথের ধারে সার দেওয়া বকুলগাছ। বড়টি রবীন্দ্রকালের। পাশে অনেকগুলি চারা মহাজনেরা রোপণ করে গিয়েছেন। পেছনে একটি বাঁধানো পুকুর। রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে এই জায়গায় বিশ্রাম নিতেন।
বকুলগাছের পাশ দিয়ে বাঁধানো পথে লাইব্রেরিতে এসে পড়লাম। ছোট একটি ঘর, লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। রবীন্দ্র-রচনবলীর সেট ও কিছু অন্যান্য বই আলমারিতে রাখা আছে। লাইব্রেরিয়ান পাশে সুদৃশ্য বাড়িটি দেখিয়ে বললেন, নতুন লাইব্রেরি

ঘর, কিছুদিনের মধ্যেই খুলে দেওয়া হবে। আমার সঙ্গে উনি বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। সামনের দিকে আঙুল তুলে বললেন, ওই যে তিনটি তালগাছ দেখছেন, এই রাস্তা দিয়ে গিয়ে ওই গাছগুলোর কাছে পৌঁছে দেখবেন রাস্তার পাশে উপেনের ভিটে। "বাবু বলিলেন, 'বুঝেছ উপেন এ জমি লইব কিনে'।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই জমিটি ওদের কাছ থেকে কেনেন। ছোট রবীন্দ্রনাথের ঘটনাটি মনে দাগ কেটেছিল। লাইব্রেরিয়ান সেরেস্তাঘর, লোকজনদের থাকার ঘর, সব চিনিয়ে দিলেন। কুঠিবাড়িতে প্রজাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছবিও রয়েছে।
কুঠিবাড়ি থেকে বেরিয়ে, সাইকেলভ্যানে চেপে কিছুদূর গিয়ে, আবার অটোয় চেপে রেলগেট পর্যন্ত গেলাম। সেখান থেকে হোটেল কাছেই। ম্যানেজারবাবুকে বলা ছিল, কারণ বারোটায় ঘর ছেড়ে দিতে হয়। আমি সোয়া বারোটা নাগাদ লাগেজ নিয়ে রাজশাহী যাত্রা করলাম। মদনপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে উঠে রাজশাহী। পড়ন্ত বিকেলে রাজশাহী নেমে একটা হোটেলে উঠলাম। হোটেলমালিক অতিশয় ভদ্র। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কী দেখবেন? আমি বললাম, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম যাব। উনি বললেন কাল যদি না থাকেন তবে আপনার লাগেজ লাগেজরুমে রেখে বের হবেন। কারণ বেলা বারোটার মধ্যে ঘর ছেড়ে দিতে হবে। কোন তাড়া থাকবে না, ধীরেসুস্থে ঘুরতে পারবেন। যখন খুশি এসে লাগেজ নিয়ে যাবেন। ভদ্রলোক নিজেও ঘুরতে খুব ভালবাসেন জানালেন। পরদিন সকালে পরোটা-সবজি খেয়ে একটা রিকশা নিয়ে বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম অভিমুখে রওনা দিলাম। কপাল মন্দ। পুজোর জন্যে মিউজিয়াম পাঁচদিন বন্ধ। কেয়ারটেকার বললেন, ভেতরে এসে চারধার ঘুরে যান। পরে না হয় এসে ভালভাবে দেখে যাবেন, এখন ঘরগুলি বন্ধ।

রাজশাহীতে আমার দ্রষ্টব্য ছিল বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম। এখানে দ্বাদশ শতকের কিছু মূর্তি রাজশাহী জেলার গোদাবাড়ি থানার দেওপাড়া গ্রাম থেকে পাওয়া যায়। এছাড়া আরো কিছু মূল্যবান প্রাচীন নিদর্শন এই মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। বাংলাদেশের মিউজিয়ামগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম সমৃদ্ধ মিউজিয়াম।
হোটেল থেকে জিনিসপত্র নিয়ে বগুড়া যাওয়ার বাস কাউন্টারে গেলাম। নাটোরের ওপর দিয়ে যাবার সময় রাস্তার পাশে দেখলাম এক বিশাল নদী। পাশের সহযাত্রীকে নদীর নাম জিজ্ঞাসা করায় বললেন এটা নদী নয়। এর নাম চলন বিল। দেখলাম বিশাল এর ব্যাপ্তি। বাসের কনডাক্টরকে বলেছিলাম যেখানে হোটেল পাওয়া যাবে সেখানে নামিয়ে দিতে। পাশের সহযাত্রীটি বললেন সামনের স্টপে নেমে যাবেন। কাছাকাছি অনেক হোটেল পাবেন। নেমে দেখলাম সেটা রিকশাস্ট্যান্ড। একজন রিকশা চালককে একটা হোটেলে নিয়ে যেতে বলায় সে আমার ব্যাগটা নিয়ে রাস্তা পেরিয়ে একটা বাজারের গলির মধ্যে রেখে, এখানে অনেক হোটেল আছে বলে চলে গেল। সামনের হোটেলের ম্যানেজার একটি ছেলেকে আমাকে অন্য একটি হোটেলে পৌঁছে দিতে বললেন। জায়গাটি তিনমাথা রেলগেট পুরানো বগুড়া। ছেলেটি আমাকে তিনতলায় পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর কাউন্টারে যিনি বসে ছিলেন আমার পাসপোর্টের ফটোকপি নিয়ে বললেন, একটা ঘর খালি আছে আপাতত থাকুন, কাল সকালে অন্য ঘর ঠিক করে দেব। যদি বের হন চাবিটা রেখে যাবেন।

পরদিন খুব ভোরে উঠলাম, মহাস্থানগড় যাব। ব্যাগে তালা দিয়ে ঘরের চাবি কাউন্টারে জমা দিলাম। নিচে অটোস্ট্যান্ডে গিয়ে জানতে পারলাম মহাস্থানগড়ের বাস চার নং রেলগেট থেকে ছাড়ে। সেখানে গিয়ে বাসে উঠলাম। ১১ কিমি মতো পথ। স্টপে নেমে জানতে পারলাম বড়রাস্তা থেকে শিবগঞ্জ রোড ধরে মহাস্থানগড় প্রায় দেড় কিমি। স্থানীয় একজন বললেন, একটা রিকশা করতে। সেই সমস্ত কিছু ঘুরে দেখিয়ে দেবে। রিকশাচালককে কত নেবে জিজ্ঞেস করাতে বলল আগে ঘুরে তো দেখুন।
প্রথমেই পড়ে সুলতানের মাজার। বলল এটা একেবারে শেষকালে দেখবেন। খানিক বাদেই দেখা গেল রাস্তার বাঁদিকে মহাস্থানগড়ের পাঁচিল। কোন কোন জায়গায় ভেঙে গেছে। মহাস্থানকে আগে পুনড্রনগরী বলা হত। পুনড্র একটি প্রাচীন জাতি। মহাস্থানগড়ের অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু এর প্রাচীর। কোন কোন জায়গা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও এর উচ্চতা ১০ ফুটেরও বেশি। আগে পুনড্র নগর প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। প্রাচীরের ওপর চার-পাঁচজন পাশাপাশি হেঁটে যেতে পারে। লোহার সিঁড়ি দিয়ে উঠে পাঁচিলের সঙ্গে লাগানো লোহার সেতু দিয়ে গিয়ে পাঁচিলে ঘোরা যায়। টিকিট লাগে।

মহাস্থানগড়ের ধংসস্তুপে খননকার্যের ফলে দেখা গেছে এর প্রায় ২৫ ফুট নিচে অকর্ষিত মাটি রয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলি নির্মাণ স্তর রয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকেও এখানে জনবসতি ছিল। এবং পরবর্তী কালে বিভিন্ন রাজবংশের দ্বারা যেমন গুপ্ত যুগে, পাল যুগে নির্মাণকার্য হয়। প্রাচীরে কয়েকটি প্রবেশদ্বার ছিল। বৈরাগীর ভিটা, গোবিন্দ ভিটা, পরশুরামের প্রাসাদ, জীয়ৎকুণ্ড, শীলা দেবীর ঘাট, লখীন্দর মেধ। অনেকে একে বৌদ্ধ উপাসনালয় ছিল বলে মনে করেন। এগুলি মহাস্থান গড়ের অন্যতম দর্শনীয় স্থান। মহাস্থানগড়ের প্রবেশ দ্বারের ডান দিকে গোবিন্দভিটা। বলা হয় যে এটি একটি বিষ্ণু মন্দিরের নিম্নাংশ। লোকমুখে প্রচলিত এখান থেকে একটি কৃষ্ণ মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। এখন মাটির ওপর খানিক ভিতটুকু আছে। এর ডান দিকে শীর্ণ করতোয়া নদী বয়ে চলেছে। জাদুঘর খুলবে দেড়টার সময়।

মহাস্থানগড় নটা নাগাদ পৌঁছে ছিলাম, সেইজন্যে ওখান থেকে ভাসুবিহার (অনেকে বসুবিহারও লেখেন) দেখতে গেলাম। স্যার কানিংহ্যাম একে উয়ান চোয়াং পোর উল্লিখিত পো-শি-পো বিহারের ধ্বংসাবশেষ বলেছেন। উয়ান চোয়াং বলেছেন, এটি একটি বিরাট সজ্ঘারাম ছিল। এখানে মহাযান মতাবলম্বী শতাধিক ভিক্ষু বাস করতেন। বিভিন্ন স্থান থেকে বহু পন্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা এই বিহারে আসতেন। এটি খ্রিস্টিয় অষ্টম-নবম শতাব্দীতে নির্মিত। এর স্থাপত্যকলা শেষ গুপ্তযুগ ও পালযুগের বলে অনুমান করা হয়।

বিহারটি সংস্কারের ফলে প্রাচীন নির্মাণের ওপর বর্তমানে পাতলা ইট ও রং ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও কোথাও ভিতের ওপর মূল পাথর বা ইট পরিলক্ষিত হয়। মূল ভিটেতে অলঙ্করণ দেখে চমৎকৃত হতে হয়। যেহেতু রচনাটি আমার ভ্রমণকাহিনি তাই ভাসুবিহার বা এর পরবর্তী বিহারগুলি ভ্রমণের সময় ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক তথ্য সবিশেষে উল্লেখ করছি না। প্রত্যেক বিহার বা দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে প্রস্তরফলকে বিহারের স্থান, কাল, নির্মাণকার্য ও নির্মাতার বিবরণ দেওয়া আছে। খননকার্যে উদ্ধার করা বস্তুসমূহের বিবরণও আছে।
ভাসুবিহার থেকে ফিরে এসে জাদুঘর খোলার পর টিকিট কেটে জাদুঘরের চত্বরে বিভিন্ন যুগের পাথর বা কাঠের ওপর অলংকৃত দরজার ফ্রেমের মধ্য দিয়ে মূল কক্ষে প্রবেশ করলাম। পোড়া মাটির জিনিস, ধাতব অলংকার, পাথরের তৈরি জিনিস, ছাঁচে ঢালা ও ছাপ যুক্ত ধাতব মুদ্রা আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক বা তারও আগে প্রচলিত ছিল। এ ছাড়াও বিভিন্ন কালে নির্মিত মূর্তিগুলি আলাদা গুরুত্ব পেয়েছে। অনুমান করা যায়, বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি হিন্দু ধর্মেরও প্রভাব ছিল।
জাদুঘর থেকে বেরিয়ে এবার গেলাম গোকুলমেধ। স্থানীয়রা বলেন বেহুলা লখীন্দরের বাসরঘর। মহাস্থানগড় থেকে ২ কিমি দক্ষিণে গোকুল গ্রামে এই সুউচ্চ স্তুপটির অবস্থান। আনুমানিক সপ্তম-বারো'শ শতাব্দীর মধ্যে এটি নির্মিত। প্রায় ৪৫ ফিট উঁচু স্তুপটি মখমলের মত সবুজ ঘাসে ঢাকা। স্তুপটির সমস্ত গায়ে ত্রিকোণাকৃতি খোপ। ওপরে ওঠার জন্যে স্তুপটির গায়ে ধাপ কাটা আছে। ধাপ দিয়ে মাথায় পৌঁছনো যায়। উপরিভাগ সমতল। একটি পোড়া ঘর আছে। একটি স্নানঘর আছে। মধস্থানে একটি কূপ। পরে কূপটি ভরাট করে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। খননকার্যের ফলে একটি স্বর্ণপাত্রে ষাঁড়ের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীকালে অনেকে এটি শিবমন্দির ছিল বলে অনুমান করেন। আবার অনেকে মনে করেন, স্তুপটির ত্রিকোণবিশিষ্ট কুঠুরিগুলিতে বৌদ্ধ ভিক্ষু বা যোগীগণের ধ্যানাসন ছিল। এই হেতু এই স্তুপের নাম দেওয়া হয় মেধ, অর্থাৎ যজ্ঞ বা পূজার স্থান। বর্তমান গবেষকগণ মনে করেন অষ্টম-নবম শতাব্দীতে রাজা দেব পাল এই বৌদ্ধ মঠটি নির্মাণ করেন। লোককথা অনুযায়ী এককালে এই স্থানেই বেহুলার বাসরঘর ছিল। তবে বেহুলার কাহিনি এর অনেক আগের ঘটনা।

এবার আমার গন্তব্য পরশুরামের জীয়ৎকুণ্ড। এটি একটি বৃহৎ কূপ। প্রবাদ, এই কূপের জলপান করে পরশুরামের সৈন্যরা সুস্থ হতেন। কথিত আছে, মহাস্থানগড়ের শেষ ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন পরশুরাম। এই পরশুরামের সঙ্গে আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন দরবেশ হজরত শাহ সুলতান মাহমুদ বলখী (রহঃ)র যুদ্ধ হয়। সে অন্য ঘটনা। জীয়ৎকুণ্ড দেখার পর গেলাম শিলাদেবীর ঘাট। অনেকে শিলাদ্বীপের ঘাটও বলেন। মহাস্থানগড়ের পূবদিকে পাঁচিল খননের ফলে একটি দরজা আবিষ্কৃত হয়। এটিকে শিলাদ্বীপের ঘাটের দরজা বলে। আবার লোককাহিনি অনুযায়ী, শিলাদেবী পরশুরামের বোন ছিলেন। উনি অনূঢ়া ছিলেন। পূবদিকে প্রবাহিত করতোয়া নদীর তীরে এই স্থানে আত্মাহুতি দেন। সেই থেকে এই স্থানের নাম হয়েছে শিলাদেবীর ঘাট। পর্যটকদের বিশ্রামের জন্য নদীর তীরে একটি বাঁধানো চত্বর রয়েছে।
এবার গন্তব্য হজরত শাহ সুলতান মাহীসাওয়ার বলখী (রহঃ)-র মাজার শরীফ। উনি ছিলেন আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন। তাঁর সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সিঁড়িপথ দিয়ে ওপরে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে এলাম। দানপাত্রে কিছু দানও করলাম। তখন চারটে বেজে গেছে। কিছু জায়গা বাদ পড়ে গেল। ঘোরা হল না। রিকশাচালককে তার প্রাপ্য মিটিয়ে বাসে ওঠবার জন্য এগোচ্ছি, সে বলল উঠে বসুন। একেবারে বাসস্টপে বাসে তুলে দিয়ে সে বিদায় নিল। চারমাথার মোড়ে নেমে একটা ভাতের হোটেলে ভাত-ডাল-সব্জি খেয়ে একটা অটো ধরে তিনমাথার মোড়ে রেলগেটের কাছে নামলাম। ওখানেই আমার আবাসিক হোটেল। নিচের দোকান থেকে কেক-বিস্কুট কিনে দেখি, দুই ভাইয়ের মধ্যে দাদা বসে আছেন, আর তাদের বাবা।
আপনার জিনিসপত্র অন্য ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি, একবার দেখে নিন। বলে দাদা চাবিটা আমার হাতে দিলেন। ওনাদের বাবা বললেন, এখানে অমুক বাড়িতে দুর্গা পুজো হয়, খুব নাম করা। সামনে একটা বারোয়ারী পুজোও হয়, যান গিয়ে দেখে আসুন। আর নবাব বাড়িটাও পারলে দেখে নেবেন। তখন সবে নবমীর সন্ধে নেমেছে আমি বললাম, এখন খুব ক্লান্ত লাগছে দেখি খানিক বাদে যদি বিশ্রাম নিয়ে যেতে পারি বলে ঘরে ঢুকে গেলাম। আর যেতে পারিনি। পরেরদিন আবার সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম। আজ যাব পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, যা সোমপুর বিহার নামেও খ্যাত।
চারমাথার মোড় থেকে বাস ধরে জয়পুরহাট। দূরত্ব প্রায় ৬০ কিমির মতো। বাস স্ট্যান্ড থেকে জয়পুরহাট বাজার অটোতে করে যেতে হবে। বাজার থেকে পাহাড় বা বৌদ্ধ বিহার রিকশা বা সাইকেল ভ্যানে যাওয়া যায়। সোমপুর বৌদ্ধ বিহার ভারতবর্ষে অন্যতম বড় বৌদ্ধ বিহার বলে খ্যাত ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে পাল বংশের রাজা ধর্মপাল এই বিহার স্থাপন করেন। টিকিট কেটে ঢুকতেই প্রাচীর বেষ্টিত বিশাল ময়দান। পাঁচিলের ধারে ধারে বিশ্রাম নেবার জন্যে বেঞ্চ রয়েছে। একটু এগোতেই বাঁ দিকের রাস্তায় জাদুঘর। জাদুঘর সেদিন বন্ধ ছিল। সোজা এগিয়ে গেলে বাঁ দিকে মন্দির। সিঁড়ির ধাপ দিয়ে উঠে চত্বরের ডান ও বাঁ দিকে বহু কক্ষের ভিত রয়েছে গোলকৃতি ভাবে মূল মন্দিরকে ঘিরে। আবার সিঁড়ি দিয়ে সমতলে নেমে মূল মন্দিরে ওঠার সিঁড়ি আছে। সমতল থেকে প্রায় ৭২ থেকে ৮০ ফিট উঁচু। মুসলমানদের রাজত্বকালে মূল মন্দিরের চূড়াটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কালে কালে ধুলো মাটি জমে পাহাড়ের আকার নেয় ও গাছপালা জন্মায় এবং জায়গাটার নাম হয় পাহাড়পুর।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বুকানন হ্যামিল্টন সাহেব এই পুরাকীর্তি প্রথম আবিষ্কার করেন এবং পরবর্তীকালে বহু প্রত্নতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহযোগিতায় খননকার্যের ফলে সোমপুরবিহারের স্বরূপ ক্রমশ উদঘাটিত হয়। গুপ্ত ও পাল বংশের রাজার আমলে নির্মিত এই বৌদ্ধ বিহার। পাল যুগে একাধিক বৌদ্ধ বিহার বিভিন্ন স্থানে নির্মিত হয় এবং এদের মধ্যে একটা যোগসূত্রও দেখা যায়। বহু তিব্বতীয় ভিক্ষু নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে সোমপুরবিহারে পদার্পণ করেন। বিহারটির মন্দির কোন ভারতীয় মন্দিরের সঙ্গে সাদৃশ্য নেই। বরং বর্মা, জাভা, কম্বোডিয়ার ক্রূশাকৃতি ভিত্তিস্থাপন ও বৌদ্ধমন্দিরের পিরামিড স্থাপত্যের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। বিশেষ করে পাল যুগে পূর্বভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটা যোগসূত্র দেখা যায়। সোমপুরবিহারে মধ্যস্থলে অবস্থিত মন্দিরটি ক্রূশাকৃতি এবং এর চারধারে প্রদক্ষিণ পথ আছে। পর্যটকদের ওপরে ওঠার সুবিধার জন্য লোহার সিঁড়ি করা হয়েছে। বিহারে এতগুলি কক্ষ থাকায় অনুমান করা হয়, যে এটি এককালে বৌদ্ধশিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এখানে বিভিন্ন যুগের বহু দেবদেবীর মূর্তি ও অন্যান্য প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে যা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ভেতরে মন্দিরের গায়ে অনেক দেবদেবীর মূর্তি ও অন্যান্য চিত্র খোদিত আছে। মূল মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করিনি বা লোহার সিঁড়ি দিয়ে ওপরেও উঠতে পারিনি। তাহলে অনেক কিছু তথ্য আরও জানতে পারতাম।

সোমপুর বৌদ্ধ বিহার থেকে বেরিয়ে এসে যথারীতি সাইকেলভ্যান ও অটো চেপে আবার বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছলাম। বাসে চেপে চারমাথার মোড়ে নেমে ভাতের হোটেলে ভাত খেলাম। তখন বিকেলের একটু আলো ছিল। ভাবলাম, নবাববাড়িটা ঘুরে নিলে মন্দ হয় না। একটা রিকশা নিলাম। আজ বিজয়া দশমী। ঠাকুর ভাসানের জন্যে ট্রাফিক পুলিশ সব রিকশা অন্য রাস্তায় ঘুরিয়ে দিচ্ছে। দেখলাম, বেশ কিছু ঠাকুর বেরিয়েছে। আমি জ্যামের মধ্যে রিকশায় বসে ঠাকুর দেখে নিলাম। রাস্তা ঘুরিয়ে দিতে রিকশাচালক নবাববাড়ি গুলিয়ে ফেলেছে। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে অবশেষে সে নিয়ে গেল। তখন সন্ধে হয়ে গেছে। ভাবলাম এখন বোধ হয় খোলা থাকবে না। দ্বাররক্ষীকে জিজ্ঞেস করে জানলাম সন্ধে সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকে। টিকিট কেটে ঢুকলাম। ঢুকেই দুপাশে খোদাই করা চিত্রিত দেওয়াল। সামনের চত্বরে ছোটদের বিনোদনের জন্য ছোট রেলগাড়ি ও আরও নানা আয়োজন রয়েছে। স্ন্যাকসের একটা দোকানও আছে। বাগানে কিছু মূর্তি রয়েছে দেড়শ বছরের পুরোনো। বাড়িটি ব্রিটিশ আমলে নীল কুঠি ছিল। পরে নবাবরা এটি কিনে নেন। কিছু জীবজন্তুও ছিল। জীবন্ত ও মূর্তি। তবে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল বলে আলো অপ্রতুল। বাড়িটির মধ্যে ঢুকতে গেলে আবার টিকিট কাটতে হয়। মানুষ-পুতুল দিয়ে সাজানো ড্রইং রুম। টেবিলের চারধারে বসে আছেন। অন্য ঘরে দেওয়ালে পরিচিতি সহ নবাবদের ছবি। গাইড দেওয়ালে পারিবারিক চিত্রকরের আঁকা কিছু ছবিও দেখালেন। এ ছাড়া নবাব আমলের কিছু বাদ্যযন্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও পোশাক রয়েছে।
নবাব বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছু খাবার কিনে সোজা হোটেলের ঘরে ঢুকে গেলাম। তার আগে হোটেলের মালিককে জানালাম অনেক ঠাকুর দেখেছি, নবাব বাড়িও ঘুরেছি।

পরদিন খুব সকালে সাতমাথা বি আর টি সি বাসস্ট্যান্ডে টিকিট কাউন্টার থেকে ঢাকা যাওয়ার টিকিট নিলাম। বৃষ্টি পড়ছিল। টিকিট কাউন্টারে যে ভদ্রলোক টিকিট দিচ্ছিলেন, বললেন ঢাকার কোন বাসস্ট্যান্ডে যাবেন। আমি পড়লাম ফাঁপরে। বললাম ঢাকা থেকে সোনারগাওঁ, ময়নামতী ক্যান্টনমেন্ট যাব। বললেন, এখুনি পৌনে সাতটায় একটা বাস আছে। গাবতলী বাসস্ট্যান্ডে যাবে। যদি মনে করেন, তবে ওটায় যেতে পারেন। আমি রাজি হয়ে গেলাম। উনি আমার হাতে একটা

টিকিট দিয়ে একটা ছেলেকে ডেকে বললেন রাস্তা পেরিয়ে বাসে তুলে দিতে। পথে যেতে যেতে সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ঢাকায় গাবতলী বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি সাধারণ মানের থাকবার হোটেল আছে কি না। ভদ্রলোক বললেন স্ট্যান্ডে ঢোকার আগেই বাসরাস্তাতে নেমে পড়বেন। এই বলে বাস কন্ডাক্টরকে ডেকে যেখানে আবাসিক হোটেল পাওয়া যাবে, সেখানে নামিয়ে দিতে বললেন। ঢাকায় নেমে একটা রিকশা নিয়ে দু চারটে হোটেল ঘুরে অবশেষে একটা হোটেলে উঠলাম।

পরদিন ভোরবেলাই বেরিয়ে পড়ব। সকালে উঠে রিকশায় চেপে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে জানতে পারলাম গুলিস্তান বাস স্ট্যান্ড থেকে সোনারগাঁও যাওয়ার বাস পাওয়া যাবে। অগত্যা গুলিস্তান যাওয়ার বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকলাম। দুজন সহযাত্রীনির সঙ্গে আলাপ হল, তারাও গুলিস্তান থেকে যাবে। তবে সোনারগাঁও ছাড়িয়ে যাবে। তাদের সঙ্গে বাসে উঠে গুলিস্তান গেলাম। তারপর গুলিস্তানের বাস কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে সোনারগাঁও যাওয়ার বাসে উঠলাম। আমি মোগরাপাড়া চৌরাস্তা নামব। সেখান থেকে বাঁদিকে এক কিমি মতন যেতে হবে। একটা রিকশা নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছালাম। পথে যেতে যেতে রিকশাচালক ছেলেটি নতুন জাদুঘর দেখাল। তবে বন্ধ। সঙ্গে আমার লাগেজ রয়েছে। রিকশাচালক আমার জিনিসপত্র একটা সেলুনের ভেতর রেখে বলল, এনার জিনিসপত্র যদি কিছুক্ষণের জন্য এখানে রাখতে দ্যান, উনি সোনারগাঁও ঘুরে এখুনি ফিরে আসবেন। সেলুনের ছেলেটি বলল রাখুন তবে বেশি দেরি করবেন না। রিকশা ছেড়ে দিয়ে দু'পা এগিয়ে দেখি সামনের রাস্তায় ব্যারিকেড। যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ। পাশে টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে সেই রাস্তায় প্রবেশ করলাম। দেখি একটি পরিত্যক্ত নগরী অতীতের স্মৃতি বহন করে চলেছে। পরপর বাড়িগুলি ইতিহাসের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

বারো ভূঁইয়ার অন্যতম ঈশা খাঁর আমলে সোনারগাঁও সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছয়। সুবর্ণ গ্রাম থেকে সোনারগাঁও নামটি আসে। বৌদ্ধ শাসক দনুজ মাধব দশরথ দেব বিক্রমপুর থেকে সোনারগাঁয়ে তেরোশো শতাব্দীর মধ্যভাগে শাসনকার্য স্থানান্তরিত করেন। পানাম নগরী সোনারগাঁও অঞ্চলে। পানাম নগরী স্থাপিত হয় উনিশশো শতকে ব্রিটিশ আমলে। এটা সুতি বস্ত্রের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। হিন্দু বস্ত্র ব্যবসায়ীরা তাদের গৃহ নির্মাণ করেন এই অঞ্চলে। এই গৃহগুলি তারই নিদর্শন। তবে সোনারগাঁওয়ে সুন্দর প্রাসাদ, লোকশিল্প মিউজিয়াম ও জয়নুল আবেদীন আর্ট এন্ড ক্রাফট মিউজিয়াম কোনটাই দেখা হয়নি। মিউজিয়ামের নতুন বাড়ি উদ্বোধন হয়নি বলে দেখা হয়নি। যাই হোক পরিতক্ত নগরীর পথে ঘোরার সময় এক ব্যক্তি, তার সঙ্গে অল্পবয়সী ছেলে, মনে হয় বাজার করে ফিরছিলেন। আমাকে ঘুরতে দেখে ওনারা দাঁড়িয়ে পড়লেন। জিজ্ঞাসা করলেন, মিউজিয়াম গেছেন? আমি বললাম নতুন বাড়িটা দেখলাম কিন্তু বন্ধ। উনি বললেন আমি আজ খুব ব্যস্ত নইলে আপনাকে চারপাশটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিতাম। আপনি জমিদারবাড়ি যেতে পারেন, কাছেই। ওখানে বৃদ্ধ দম্পতি থাকেন। জমিদারবাড়ি গেলে অনেক কথা জানতে পারবেন। কাছেই শিব মন্দির আছে। বললাম দেখি পারি তো নিশ্চয়ই যাবো। টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি সেলুনে ঢুকে আমার জিনিসপত্র নিয়ে একটা রিকশায় উঠে পড়লাম। জমিদারবাড়ি যাওয়া হলো না, জাদুঘর দেখা হল না। শুধু এক টুকরো অতীত ইতিহাস মনে আঁকা হয়ে রইল। রিকশা আমাকে বাসরাস্তায় নামিয়ে দিল।

মোগরাপাড়া থেকে ময়নামতী ৬৮ কিমি। কুমিল্লা পৌঁছবার ৭ কিমি আগে ক্যান্টনমেন্ট। বাসে উঠে কন্ডাক্টরকে বললাম ময়নামতী ক্যান্টনমেন্ট যাব। যেখানে থাকার হোটেল পাওয়া যাবে, এরকম জায়গায় নামিয়ে দেবেন। আমি বৌদ্ধ বিহারগুলো দেখবো। ময়নামতী ক্যান্টনমেন্ট বাজারে সে আমাকে নামিয়ে দিল। বাস থেকে নেমে এদিক সেদিক তাকাচ্ছি, একটা ছেলেকে আসতে দেখলাম। তাকে হোটেলের কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে আমার ট্রলিব্যাগটা নিয়ে, আসুন বলে খানিক

এগিয়ে পাশের গলিতে ঢুকে, একটা বাড়ির তিনতলায় উঠলো। ব্যাগ রেখে ঘর খুলে রেজিস্টার খাতা নিয়ে এসে বলল, ম্যানেজার এখন নেই, আপনার কোন অসুবিধা হবে না। ময়নামতী ক্যান্টনমেন্ট সেনা বিভাগের এলাকার মধ্যে রয়েছে রাণী ময়নামতীর প্রাসাদ বর্তমানে ধ্বংসস্তূপ, একটি টিলা, চারপত্র মুড়া, কোটিলা মুড়া। কোটিলা মুড়া থেকে ৩ কিমি দক্ষিণে শালবন বিহার। তার ঠিক উল্টো দিকে নবশালবন বিহার থাইল্যান্ড সরকারের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত। শালবন বিহারের পাশেই জাদুঘর। সেদিন বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন গেলাম শালবন বিহার। হোটেলের ছেলেটি একটি শেয়ারের টাটা সুমোয় তুলে দিল। টাটা সুমো আমাকে বড় রাস্তায় ছেড়ে দিল। সেখান থেকে রিকশা নিয়ে ভেতরে খানিকটা রাস্তা যেতে হবে। শালবন বিহারে নেমে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে দেখলাম পাঁচিল দিয়ে ঘেরা সুন্দর বাগানের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে পথ।

আমার সঙ্গে সাইকেল নিয়ে এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। জানালেন তিনি এই বিহারের তত্ত্বাবধান করেন। সাইকেল অফিসঘরে রেখে এসে সমস্ত কিছু ঘুরে দেখাতে লাগলেন। সমতল থেকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হয়। ওপর থেকে কেন্দ্রস্থলে দেখা যায় মূল মন্দিরটি ক্রুশাকৃতি। চারিধারে ভিক্ষুদের বাসগৃহ। মধ্যস্থলে মূল মন্দির ছাড়াও অন্যান্য বৌদ্ধ মন্দির খননকার্যের ফলে উদ্ধার হয়েছে। তবে কোনটাই পূর্ণাঙ্গ মন্দির নয়, নিম্নাংশটুকু সংরক্ষণ করা গিয়েছে। ফলকে এর বিবরণ দেওয়া আছে। আগে এই প্রত্নস্থানটি শালবন রাজার বাড়ি নামে পরিচিত ছিল। খননের পর বেশ কিছু ভিক্ষুকক্ষবিশিষ্ট একটি বৌদ্ধবিহারের ভূমি নকশা উন্মোচিত হয়েছে। বিহারটিতে চারটি ও কেন্দ্রীয় মন্দিরে ছটি নির্মাণ যুগের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। খননে প্রাপ্ত একটি পোড়ামাটির মুদ্রা থেকে জানা যায় এই বিহারটি দেব বংশের চতুর্থ রাজা শ্রী ভবদেব খৃষ্টীয় আট শতকে নির্মাণ করেছেন। এর আসল নাম ছিল ভবদেব মহাবিহার। খনন থেকে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলির আনুমানিক কাল সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর। এগুলি শালবন বিহার জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। শালবন বিহার থেকে বেরিয়ে এসে পাশেই জাদুঘরে টিকিট কেটে ঢুকলাম। জাদুঘরে ঢোকার আগে পাশে ঘেরা এলাকায় কিছু ফসিল রাখা আছে। জাদুঘরে নানা মুদ্রায় বুদ্ধমূর্তি ছাড়াও নানান দেবদেবীর মূর্তি ও আছে। একটি বিশাল ঘন্টা দ্রষ্টব্য বস্তুগুলির মধ্যে অন্যতম। কোটিলা মুড়া, চারপত্র মুড়ার মডেল কাঁচের শোকেসে প্রদর্শিত হয়েছে। এছাড়া মুদ্রা ও নানান ব্যবহৃত বস্তুও রয়েছে। শালবন বিহার জাদুঘর থেকে বেরিয়ে, রিকশা নিয়ে, কাছেই রূপবানমুড়া ও ইটখোলা বিহারে গেলাম। সামনে সেনাবাহিনীর জওয়ানদের এলাকা। বড় রাস্তা থেকে বাঁদিকে খানিক চড়াইয়ে উঠে রূপবান বিহার। বিহারের খোলা চত্বরে প্রবেশদ্বার হচ্ছে। পাশে পাথরের ফলকে বিহারের বিবরণ লেখা আছে। সেখান থেকে ফিরতি পথে একটা অটো ধরলাম। একটুখানি রাস্তা, অটোচালক ভাড়া নিতে চাইলেন না। দুপা হেঁটে ইটখোলা বিহার। উন্মুক্ত এলাকায় দেখি একটি লোক মাঠের ঘাস ছাঁটছে। আমাকে দেখে উঠে এসে বললেন, যান সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেখে আসুন বুদ্ধমূর্তি আছে। তবে মাথায় কোনো আচ্ছাদন নেই। আমিই দেখাশোনা করি। মাটি কোপাতে গিয়ে তামার ফলকে লেখা পেয়েছিলাম, মুদ্রাও পেয়েছিলাম। অফিসারের কাছে জমা দিয়েছি। এইজন্য ওনারা আমাকে পুরস্কার দিয়েছিলেন।

এবার হোটেলে ফিরে চললাম, আজই চট্টগ্রাম যাব, সঙ্গের ব্যাগ লাগেজ রুমে জমা করে দিয়েছিলাম। হোটেলের ছেলেটি আমার জিনিসপত্র নিয়ে একটা ভাড়ার টাটা সুমোয় আমাকে তুলে দিয়ে ড্রাইভারকে চট্টগ্রাম যাওয়ার বাসে তুলে দিতে বলে দিল। গাড়ির যাত্রীরা একে একে নেমে গেল। ড্রাইভার জানালো এখানেই শেষ, তবে আপনাকে আমি একটু আগে চট্টগ্রামের বাস যেখানে থামে সেখানে নামিয়ে দেবো। টাটা সুমো থেকে নেমে দাঁড়িয়ে আছি কোন বাসই থামে না। বলে

সিট নেই। আগে থেকেই বোধ হয় বুকিং হয়ে গেছে, আমি মহিলা, তার ওপর বয়স্ক মানুষ, তাই হয়তো তুলতে রাজি হল না। রাস্তার উল্টোদিকে একজন বাস ধুচ্ছিল, জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন? বললাম, চট্টগ্রাম।

(ক্রমশঃ)

বাহাত্তর বছরের নীলিমা ঘোষ ঘরের কাজের থেকে সময় করে মাঝেমাঝেই বেরিয়ে পড়েন পথে। তাঁর আগ্রহ ভ্রমণস্থানটির প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

পাহাড়িয়া পুরুলিয়া

রাহুল গুহ

অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছি কিন্তু, পাহাড়টা আর কিছুতেই যাওয়া হচ্ছে না! অনেকে অনেক রকম ভাবে সহযোগিতা করেছেন ট্যুর পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে তবুও রেলিং ঘেঁষে দার্জিলিং রোলিং হয়ে গিয়েছে। পাহাড়টা ভেস্তে গেলে তুরন্ত্ পুরুলিয়াটা ঠিক করে ফেললাম । হ্যাঁ, পাহাড় তো আছে! আর যেমন ভাবা তেমনই কাজ! থাকা ঘোরা বন্দোবস্ত হলে ট্রেনের টিকিট করে নিলাম। হাওড়া - পুরুলিয়া সুপারফাস্ট ধরে সুপার ভাবে গন্তব্যে পৌঁছালাম।
অতিথিশালার অভাব নেই পুরুলিয়াতে। আজকের দিনে ইন্টারনেট ঘেঁটে নিমেষেই খোঁজ মেলে নানান হোটেলের। পরদিন গাড়িতেই সকালের খাদ্য মজুত করে পাহাড়ের দিকে রওনা দিলাম। মাঠা অরণ্য অঞ্চল দিয়ে রাস্তা যেভাবে তার বাঁক নিয়েছে সেভাবেই চারিধারে সবুজের সাথে সখ্যতা করে ছুটল আমাদের গাড়ি। পুরুলিয়ার রাস্তা ভাল তবে পাহাড়ের অপর দিক অর্থাৎ বামনি, তুর্গা জলপ্রপাতের দিক দিয়ে নামার পথ বড়ই বন্ধুর। পাহাড়ের প্রথমেই ধরা দিল পি পি এস পি লোয়ার ড্যাম (P.P.S.P Lower Dam)।

লোয়ার ড্যাম থেকে পাখির চোখে আপামর অঞ্চলের অপরূপ সৌন্দর্য ধরা দেয়। তারপর বেশ খানিকটা ওপরে ওঠার পর দেখা মিলল আপার ড্যাম-এর।

কিছুটা সময় নিয়ে ঘুরে ঘুরে ছবি তুললাম। এক অপার শান্তি মিশে রয়েছে চারিদিকে। এখান থেকে এবার বামনি, তুর্গার দিকে অগ্রসর হলাম। পথে যেতে যেতে পড়ল মার্বেল লেক।

চারিধারে মার্বেল-এর পাহাড়, তারই মাঝে ছোট্ট একটি জলাশয়। ভারি সুন্দর জায়গাটি। তারপর আমাদের গন্তব্য বামনি, তুর্গা। হেলতে দুলতে চড়াই উতরোলাম। বামনির নিচের দিকে হাঁটতে শুরু করেছি এরই মধ্যে টুপটাপ বৃষ্টি আরম্ভ হল। ভরসা পেলাম না, চটপট উঠে এসে সোজা গাড়িতে। আর তুর্গা, ময়ূর পাহাড়, পাখি পাহাড়, লহড়িয়া শিব মন্দির দেখা হল না। নেমে এলাম বাগমুন্ডি মোড়ে। সেখানে দুপুরের খাওয়া সারলাম। তারপর ভরা উদর নিয়ে আমাদের পরের গন্তব্য চড়িদা (মুখোশ) গ্রাম।

পরপর সারিবাঁধা দোকান ঠিক কুমোরটুলির মতো। সব দোকান এক এক করে ঘুরে দেখা, ছবি তোলা, দোকানে দরদাম করা। কিনেও নিলাম হাতের কাজের সুন্দর সুন্দর পুরুলিয়ার স্মৃতি। ওখান থেকে আরও ৯ কি.মি গেলে দেখা মিলবে খয়ড়াবেরা ড্যামের। ফিরে এলাম আজকের মতো আস্তানায়। আবার কাল শুরু করব ।

পরদিন সকাল থেকে আবার ঘুরে দেখার পালা। মোটামুটি ঠিকঠাক করেই রেখেছিলাম আজ কোথায় কোথায় যাব আর তাই জামা গুঁজে, গুগল খুঁজে বেরিয়ে পড়লাম আমাদের গন্তব্য দেউলঘাটার দিকে।
সোজা পুরুলিয়া-রাঁচি রোড ধরে ছুটল গাড়ি। ঘন্টা খানেকের (প্রায় ৩০ কি.মি) মধ্যে পৌঁছে গেলাম আমাদের প্রথম গন্তব্যে। ইতিহাসবিদদের মতে আনুমানিক দশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়খণ্ডের কিছু অংশে জৈন স্থাপত্য গড়ে ওঠে। সেই সময় প্রচুর পরিমাণে ইট ও পাথরের মন্দির তৈরি হয়। কশাই নদীর তীরে তিনটি স্থাপত্যের মধ্যে দুটি অবশিষ্ট রয়েছে। আশ্চর্য কারুকার্যের নিদর্শন নিয়ে আজও অবিচল দেউলঘাটার স্থাপত্য।

দেউলঘাটা থেকে বেরিয়ে আমাদের পরের গন্তব্য মুরগুমা। ঝালদা ব্লক অন্তর্গত বেগুন কোদরের উত্তর দিকে অবস্থিত। কংসাবতীর শাখার উপর বর্তমান মুরগুমা ড্যাম। সুন্দর, নির্জন, কোলাহল বর্জিত আদর্শ পিকনিক স্পট ও পুরুলিয়ার অবশ্য দ্রষ্টব্যগুলির মধ্যে একটি। প্রকৃতিকে উপভোগ করার আদর্শ স্থান।

ঝালদা থেকে ইচাক মোড় হয়ে খামার রোড ধরে যেমন ভাবে রাস্তা এঁকে বেঁকে গেছে সেই পথ অনুসরণ করে চলল আমাদের গাড়ি জঙ্গলের বুক ভেদ করে। এতক্ষণ পাহাড়গুলো নিজেদের গুটিয়ে রাখলেও অবশেষে তারা হাজির চোখের সামনে। গ্রাম্য ঘ্রাণ গায়ে মেখে প্রকৃতির অপরূপ শোভা দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম জজহাতু-তে। সিন্দ্রিয়া, জারিয়া, কীর্তনিয়া পাহাড়ের পাদদেশ জুড়ে বিস্তৃত গ্রাম আদিবাসী সম্প্রদায়ের সহাবস্থানে জজহাতু যেন পুরুলিয়ার এক টুকরো স্বর্গ।

একরাশ শান্ত স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা বাতাস দিয়ে জজহাতু আমাদের স্বাগত জানাল, কিন্তু ইতিমধ্যেই আবার কালো ঘনঘটা! পাহাড়ের উপর কালো মেঘের কুণ্ডলী, আবার বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। চালক বলল বিকেল হয়ে আসছে, বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। বন্য হাতি নেমে আসার সম্ভাবনা থাকে। একেই জজহাতুর অপূর্ব শোভা তার উপর হাতির কথা ভেবে শিহরিত হচ্ছে সারা শরীর! এক আশ্চর্য অনুভূতি। উপায় নেই তাই অগত্যা গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরলাম।
তৃতীয় দিন সকাল থেকেই আবহাওয়া দুর্দান্ত ছিল। যখন বেরোলাম বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে ফুর ফুর করে। জয়চণ্ডী পাহাড়ের দিকটা আমাদের প্রথম গন্তব্য। গাড়ি ছুটল সেদিকেই। পুরুলিয়া - বরাকর - আসানসোল রোড হয়ে যেতে যেতে দেখেছি দুরে আবার মেঘ ষড়যন্ত্র করা শুরু করছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি আরম্ভ হল। বর্ষণের গতি ও গাড়ির গতিতে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলছে। ধুন্ধুমার বৃষ্টি! গাড়ির কাচের ওপর বৃষ্টির জল আর ওয়াইপারের তুমুল লড়াই চলছে ! বৃষ্টি নিয়েই পৌঁছলাম জয়চণ্ডী পাহাড়ে।

আদ্রা ও রঘুনাথপুরের মাঝে অবস্থিত জয়চণ্ডী পাহাড় থেকেই অঞ্চলের নাম জয়চণ্ডী। এখানেই সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "হীরক রাজার দেশে"র একটা অংশ শুটিং হয়েছিল। পাহাড়ের উপর বিরাজ করছেন মা চণ্ডী। রয়েছে তাঁর মন্দির। চারশ আশিটি সিঁড়ি অতিক্রম করে পৌঁছে যাওয়া যাবে মায়ের মন্দিরে। পঁচানব্বই কে.জি ওজন নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে বসে প্রবল বৃষ্টিতে মুড়িমাখা আর চা খেতে খেতে ভাবছিলাম ওপরে যেতে পারব তো! তখনই মনে পড়ল চক্ দে, কবীর খান আর "ইয়ে সত্তর মিনট্"। আর বেশি দেরী না করে ছাতা হাতে সোজা ওপরের দিকে রওনা হলাম। বর্ষার সময় পাহাড় আর

জঙ্গলের শোভা এক আলাদা মাত্রা পায়। এসব দেখতে দেখতে একসময় পৌঁছলাম পাহাড়ের ওপর অবস্থিত মায়ের মন্দিরে। ওপর থেকে জয়চণ্ডীর দৃশ্য অবর্ণনীয়। বৃষ্টি তখনও হচ্ছে।

গড় পঞ্চকোট যখন পৌঁছলাম, বৃষ্টি থেমে গেছে। ট্যুরিস্টের বেশ আনাগোনা চলছে এই অঞ্চলে। পাঞ্চেত পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত পঞ্চকোট প্যালেস। ১৭৪০ সালে আলীবর্দি খান বাংলার নবাব হন তৎকালীন সরফরাজ খানকে হত্যা করে। সরফরাজ খানের আত্মীয় রুস্তম জং প্রতিশোধ নিতে গেলে আলীবর্দির কাছে পরাস্ত হন। রুস্তম তখন ডান হস্ত হন নাগপুরের মারাঠা রাজা রঘুজী ভোঁসলের। পাঞ্চেত দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে হানা দিল মারাঠা সৈন্য দল যাদের আমরা বর্গী বলে আখ্যা দিই। প্রায় দশ বছর ধরে বাংলার বুকে নির্মমভাবে চলতে থাকে বর্গী হানা। সেই বর্গী আক্রমণের অন্যতম নিদর্শন রূপে আজও নিজের সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে গড় পঞ্চকোট। পাশেই চারুলতা রিসর্টের ওয়াচ টাওয়ার থেকে পাখির চোখে গড় পঞ্চকোট, এক কথায় চোখের প্রশান্তি।

পথে গড় পঞ্চকোট ইকো ট্যুরিজমে মধ্যাহ্ন ভোজ সেরে পাঞ্চেত ড্যামের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বেশ ভাল ব্যবস্থা! দুশো টাকায় নিরামিষ ও আড়াইশো টাকায় আমিষ ব্যুফে। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের প্রথম পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত চারটি বহুমুখী বাঁধগুলির মধ্যে পাঞ্চেত বাঁধ হল সর্বশেষ - ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ধানবাদ জেলার অন্তর্গত। পাঞ্চেত ড্যাম, দামোদর নদের ওপরে নির্মিত হয়েছিল এবং ১৯৫৯ সালে এটি চালু হয়েছিল। পুরুলিয়ার কাছাকাছি সুবিশাল দামোদর নদের উপর এই বিশাল বাঁধ অবশ্যই দ্রষ্টব্য। পাঞ্চেত ড্যামের খুব কাছেই রয়েছে মোবারক আনসারির মোবারক স্নেক গার্ডেন। আমাদের বড়ন্তি যাওয়ার তাড়া ছিল তাই যাওয়া হল না।

তখন বিকেল ও সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণ, অপরূপা হয়ে উঠেছিল বড়ন্তি। সন্ধ্যার আকাশ যেন তাকে আগলে রেখেছে দুহাত দিয়ে। মনমোহিতকরা দৃশ্য। নিশ্চিন্তে দুটো রাত এখানে কাটিয়ে দেওয়া যায়, এমন সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে রেখেছে বড়ন্তি। পুরুলিয়ার বিশেষত্ব হল তার এক একটি স্থান এক এক রকমের সুন্দর। পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর মহকুমার অন্তর্গত সন্তুড়ির একটি ছোট উপজাতি গ্রাম হল বড়ন্তি। মুরারডি লেকের পাশে অবস্থিত। এটি পশ্চিমবঙ্গের একটি ক্রমবর্ধমান পর্যটন স্পট।
ফেরার দিনে ধামসা, মাদল, টুসু, ভাদুকে বিদায় জানিয়ে ৩৩০ কি.মি. দূরের পথ পাড়ি দেওয়ার পালা।
"পুরুলিয়া ট্য বড্ড সুন্দর জাগা! ম্যনে পুড়বে উয়াকে বড়।"

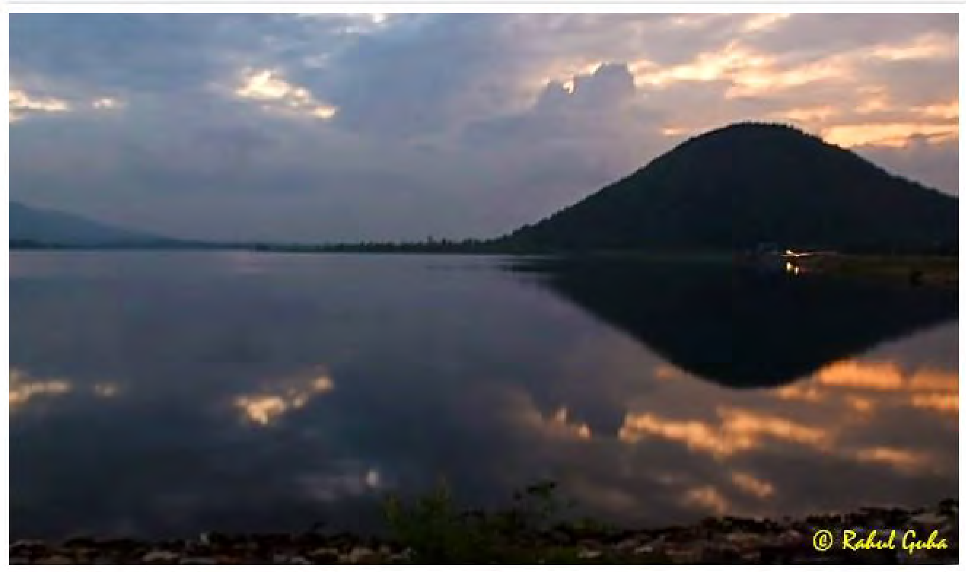

রাজ্য সরকারি কর্মচারী রাহুল গুহ ভালোবাসেন বেড়াতে ও ছবি তুলতে।

tell a Friend

বারাণসী ও এলাহাবাদ

তপন পাল

পূর্বপ্রকাশিতের পর -

~ বারাণসীর আরও ছবি ~

তৃতীয় দিন
এদিন সকাল হল খুব তাড়াতাড়ি। যখন চাকরি করতাম, বড়সাহেবের দাঁতখিঁচুনির ভয়ে ভোর না হতেই উঠতে হত, সঙ্গে অফিসের ভাত দিতে শ্রীমতী পালকেও। গৃহীতাবসর জীবনেও অভ্যাসটা রয়ে গেছে। আমরা যখন বেরোলাম, কলকাতায় সকাল হয়েছে, বারাণসীতে তদবধি আলো-আঁধারি।

বারাণসী থেকে ৩৫ কিমি দুরে চুনার। পথ রেললাইন আর গঙ্গার ধার দিয়ে, পাহাড়ের পথ ধরে। গঙ্গার ধারে বিন্ধ্য পর্বতমালার ২৮০ ফুট উঁচু এক টিলার উপরে সুবিশাল দুর্গ। এবং লোকবিশ্বাসে ভুতের আবাস। সূর্যাস্তের পর দুর্গচত্বরে থাকা নিষেধ। হঠাৎ হঠাৎ নাকি আলো জ্বলে ওঠে, তাপমাত্রা নেমে যায়, গঙ্গায় ভেসে থাকা ডিঙি নৌকার মাঝি শুনতে পান দূরাগত ফিসফিসানি। অতৃপ্ত কামনা কি এমনি করেই তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় মানুষকে, মৃত্যুর পরেও? আমিও কি তবে মরে ভূত হবো? ঢোকার মুখেই গাইড বলে দেন দুর্গচত্বরে ভ্রমণকালে কোন স্বর শুনলে উত্তর না দিতে, অন্ধকার আনাচে কানাচে উঁকি না মারতে, বিগতযুগের পোশাক পরা কাউকে এখানে ওখানে দেখলে সরে যেতে, দুর্গচত্বরে একা না হতে। গ্যাংস অফ ওয়াসেপুর সিনেমার এক সহপরিচালক এখানে অজ্ঞাত কারণে মারা গিয়েছিলেন - গাইড বলেন তিনি নাকি বারবার এই নির্দেশিকাগুলি লঙ্ঘন করেছিলেন। আমার এক ভূতে অবিশ্বাসী ভাইপো মধুচন্দ্রিমায় মির্জাপুর গিয়েছিলেন ঝরনা দেখতে। ফিরে এসে বিয়ে প্রায় ভাঙে ভাঙে। চুনার দুর্গচত্বরে এক গাইড তাদের ভূগর্ভস্থ বন্দীশালার কুঠরিগুলি (dungeon) ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন; পাশেই বধ্যভূমি। আচমকা দুজনেই ফিসফিসানি শোনেন; এবং অলীকশ্রবণ বিবেচনায় ভীত না হয়ে, পিছন ফিরে গাইডকে সেকথা বলতে গিয়ে দেখেন গাইড আক্ষরিক অর্থেই হাওয়া। বেলেপাথরের এই দুর্গের নির্মাতা কে, কেউ জানে না; আর সেইজন্যেই গল্পের গরু বারবার গাছে ওঠে।

লোকবিশ্বাসে ভ্রাতা ভর্তৃহরির জন্য দুর্গটি বানিয়েছিলেন মহারাজা বিক্রমাদিত্য। দুর্গটি নদীর পাশে, দুর্গের দক্ষিণ পূর্বের অনেকখানি অংশ নদীর ভিতরে ঢুকে এসেছে; সেই অংশ অত্যন্ত খাড়াই। এবং সেই কালে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল জলপথ। শত্রু এলে তাকে ওই নদী দিয়েই আসতে হবে, টিলার উপরের দুর্গ থেকে আমি সবদিক দেখতে পাব ও তোপ দাগবো, খাড়াই বেয়ে গড়িয়ে দেবো পাথর। এই অবস্থানগত সুবিধার কারণে পূর্ব গাঙ্গেয় অববাহিকার দখলদারির চাবিকাঠি ছিল এই দুর্গ। দুর্গচত্বরের দেওয়াললিপি জানাচ্ছে সেই দখলদারির সালতামামিঃ
উজ্জয়নীর মহারাজা বিক্রমাদিত্য – খ্রিস্টপূর্ব ৫৬। পৃথ্বীরাজ চৌহান ১১৪১ – ১১৯১। মহম্মদ ঘোরি ১১৯৪। স্বামী রাজা ১৩৪৪। জৌনপুরের মাহামুদ শাহ শারকি ১৪৪৫। দ্বিতীয় সিকন্দর লোদি ১৫১২। বাবর ১৫২৯। শের শাহ সুরি ১৫৩০, হুমায়ুন ১৫৩৬। শের শাহ সুরি পুনরায় ১৫৩৮। ইসলাম শাহ সুরি ১৫৪৫ – ১৫৫২। আকবর ১৫৭৫। মিরজা মুকিম ১৭৫০। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৫০, সুজা উদ দৌলা ১৭৬৫। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পুনরায় ১৭৭৫। পরিশেষে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৬৫। ১৮৯০ অবধি ছিল কোম্পানির ফৌজের সেনাছাউনি। তারপর দুর্গ আসে নাগরিক প্রশাসনের হাতে। প্রসঙ্গত, শের শাহ সুরি দুর্গ জয় করেছিলেন যুদ্ধ করে নয়, ভালোবেসে - ইব্রাহিম লোদি নিযুক্ত জায়গিরদার তাজ খানের বিধবা পত্নী সারঙ খানিকে বিবাহ করে। দুর্গ থেকে এক গোপন সুড়ঙ্গ গঙ্গায়; বিপদকালের এসকেপ রুট, মতান্তরে রাজকন্যা সোনওয়ার গঙ্গাস্নানের পথ। বর্তমানে দুর্গটি প্রভিনশিয়াল আমর্ড কোর-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, তাই কেবলমাত্র সোনহা মন্ডপ ও ভর্তৃহরির সমাধি ছাড়া দুর্গের অভ্যন্তরে সাধারন পর্যটকদের প্রবেশাধিকার নেই। প্রবেশমূল্য নেই, কিন্তু সরকারি খাতায় নাম ঠিকানা সময় লিখে ঢুকতে হয়, বেরোবার সময়েও তাই। লাল সুড়কির পথ বেয়ে দুর্গের শীর্ষে পৌঁছলে ধীরপ্রবাহিণী গঙ্গা ও চুনার শহরের ছবি প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

এর আগে কয়েকবার আসার সূত্রে আমার গাইড লাগে না, বরং বেশ মাতব্বরি করে যারা গাইড নেননি তাঁদের জ্ঞান দিই। মস্ত এক পাথরের কুয়ো, তার অনেক নীচে জল; পাশ দিয়ে জলের কাছে যাওয়ার রাস্তা নেমে গেছে, কিছুটা অংশে সিঁড়ি। নামা যায়, আগে নেমেওছি, তবে উত্তরষাটে সেই উৎসাহ পেলাম না। পাশে কয়েদখানা, ফাঁসির মঞ্চ, পাতালঘর। পুরাণমতে বামন অবতারে ভগবান বিষ্ণু এখানেই তাঁর প্রথম চরণ স্থাপন করেন; তাই এর নাম হয় চরণাদ্রি। উজ্জয়িনীর মহারাজা বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ভর্তৃহরি এখানে কঠিন তপস্যান্তে জীবন্তসমাধি নিয়েছিলেন। এখনও নাকি তিনি সূক্ষ্ম দেহে এই দুর্গেই অবস্থান করেন। মতান্তরে রাজা সহদেব ১০২৯ সালে বর্তমান দুর্গটি নির্মান করেন। রাজা সহদেবের সাহসী কন্যা সোনহা বা সোনওয়ার সঙ্গে তৎকালীন মাহবার মহারাজা আলহাখন্দের বিবাহস্থল হিসাবে নির্মিত 'সোনহা-মন্ডপ' আঠাশটি স্তম্ভের উপর চন্দ্রাতপের হিন্দু স্থাপত্য, সঙ্গে খিলান, এককালে সেগুলি নাকি সোনায় মোড়া ছিল। সোনহা-মন্ডপের আর এক নাম কুঁয়ারা মন্ডপ। সোনহা কনের সাজে অপেক্ষা করেছিলেন, কিন্তু শুভলগন গেল চলে, প্রেমের অভিষেক … হল না … নয়নজলে। বিরহে তাপের দিনে ফুল গেল শুকায়ে- মালা পরানো হল না তব গলে। পাশে সাত মিটার ব্যাসের বাওলি - জল ভরার চৌবাচ্চা – গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত। বিষ্টি বাদলা হলে রাজকন্যা সোনওয়া এখানেই নাইতেন। চৌবাচ্চাটি অদ্যাবধি জলপূর্ণ। আরনেস্ট হেমিংওয়ের (জুলাই ১৮৯৯ – জুলাই ১৯৬১) হাভানার ভিলার সুইমিং পুলে এক নিশুতি রাতে দিগবসনা আভা গার্ডনার (ডিসেম্বর ১৯২২ – জানুয়ারি ১৯৯০) নাকি সাঁতার কেটেছিলেন। পাপা হেমিংওয়ে তাই দেখে পুলের জল আর বদলান নি। এখানেও সে রকম কোন গল্প আছে কি না কে জানে!

বাওয়ন খাম্বো কি ছত্রি রাজামশায়ের বাহান্নজন শাসককে পরাভূত করার স্মারক। রাজস্থানের মত এই দুর্গ কোন রাজারাজড়ার বাসস্থান রূপে গড়ে ওঠে নি। প্রথম থেকেই এটি সামরিক সেনাছাউনি। তাই গ্ল্যামারের কিঞ্চিৎ ঘাটতি।
চুনারের অপরাপর দ্রষ্টব্য - ওয়ারেন হেস্টিংস-এর বাড়ি এখন জাদুঘর। পাশে ১৭৮৪ তে নির্মিত সূর্য ঘড়ি।
ভালোবাসার কুয়া তৈরি করেছিলেন মহারাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর রানীর অপরাহ্নিক গা ধোয়ার জন্য।
হজরত সুলেমানের দরগা, আকবরের দিন-ই-ইলাহির বিরোধিতা করায় এখানেই বন্দী হয়ে ছিলেন। পাথরখোদাই শিল্পীদের কাজ, ২ কিমি দূরে দুর্গামন্দির ও কালীমন্দির। রেলস্টেশনের কাছে দুর্গা কুণ্ড, কামাক্ষী দেবীর মন্দির ও আরও কিছু মন্দির।

আমার চাকরিজীবনের দ্বিতীয় ঠাঁই ছিল বহরমপুর। অনেকদিন (১৯৮৫ – ১৯৯২) সেখানে ছিলাম, কাজের সূত্রে পুরো জেলা চষে বেড়াতে হত। চুনারের সঙ্গে আমার ভালোবাসার প্রধান কারণ সেই বহরমপুর। এখানেও সেই ওয়ারেন হেস্টিংস, সেই ব্যারাক, দুর্গ থেকে ঢালু পথ বেয়ে নিচে ইউরোপিয়ান সিমেটারি, তার গড়ন স্থাপত্য সময়কাল সবকিছুই বহরমপুরের বাবুলবোনা রেসিডেন্সি কবরখানার মত। লালদিঘি আবাসনের কাছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের ডিপো পার

হয়ে জাতীয় সড়কে পড়লেই রাস্তার দুধারে মস্ত মস্ত বনস্পতি, তার ছায়া, ডাইনে উঁচু জমি মধুপুর ছাড়িয়ে চলে গেছে পঞ্চাননতলা রেলগেট অবধি। যতবার চুনার আসি, মনে হয় ফেলে আসা সেই দিনগুলির বহরমপুরে আবার ফিরে এসেছি।

সেখান থেকে একান্নপীঠের অন্যতম বিন্ধ্যাচল; বারাণসী থেকে ৭০ কিমি। সেখানকার বিন্ধ্যবাসিনী মন্দিরে নাকি সতীর বামপায়ের আঙুল পড়েছিল। শহরে ঢোকার মুখেই বসে আছেন লাল ভৈরব – অনেকটা আমাদের পঞ্চানন্দের মত। দুর্গা বিন্ধ্যাচলে জনপ্রিয় বিন্ধ্যবাসিনী নামে। মহিষাসুর বধের জন্য দেবতাদের তেজে তিনি আবির্ভূতা হয়েছিলেন এখানে; মহিষাসুরকে সংহারের পর দুর্গা নামে দশভুজারূপে তিনি এখানেই চিরস্থিতা। পরবর্তীকালে দেবী এখানেই শুম্ভ নিশুম্ভকে বধ করেছিলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী মন্দির থেকে তিন কিমি রে বিরাজমানা দেবী অষ্টভুজা। পুরাণমতে যশোদার গর্ভজাত মহামায়াকে কংস দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান ভেবে আছাড় মারতে উদ্যত হলে, মহামায়া কংসকে কে বধ করবে তা শুনিয়ে বর্তমান মন্দিরস্থলে বিরাজ করতে থাকেন। সংকীর্ণ গুহাপথে ভেতরে গিয়ে মূর্তি দর্শন করতে হয়।
বিন্ধ্যপবর্তের ওপরে একটা গুহার মধ্যে মাকালীর জাগ্রত মুখ কালীখোহ। শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের সময় দেবী কৌষিকীর ভ্রূকুটি থেকে আবির্ভূতা হয়েছিলেন কালী। চণ্ড-মুণ্ড বধের জন্য যিনি চামুণ্ডা, যিনি রক্তবীজ বধের সময়ে তার রক্ত পান করে তাকে বধযোগ্য করেছিলেন! সেই চামুণ্ডাদেবীও সশরীরে বিরাজ করেন বিন্ধ্যাচলে। পূজা পান মহাকালী রূপে। কালীখোহতে দেবী হাঁ করে আছেন! রক্তবীজের পাপরক্ত পানে তাঁর সর্বাঙ্গে এত জ্বালা ধরে গিয়েছিল যে শরীর ঠাণ্ডা করতে তিনি হাঁ করে আছেন। ভক্তরা ডাবের জল দেবীর মুখগহ্বরে দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করেন। লোকবিশ্বাস, এই তিন মন্দির দর্শন করলেই (মহাত্রিকোশ পরিক্রমা) ত্রিলোকপরিক্রমা সম্পন্ন হয়। সীতাকুণ্ড, বনবাসকালে সীতা এখানে স্নান করেছিলেন, ভিন্নমতে সীতার জলতৃষ্ণা মেটাতে লক্ষ্মণ বাণ মেরে এই কুণ্ড সৃষ্টি করেন। দেবী অষ্টভুজা ও কালীখোহ দুটি মন্দিরই জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের উপর। তবে মানুষের লোভের মুখে পড়ে জঙ্গল ও পাহাড় দুইই যাচ্ছে – জমি সমতল করে গড়ে উঠছে নব নব মন্দির, আশ্রম, গেস্ট হাউস।

ফেরার পথে সারনাথ। সুজাতার পায়েস গ্রহণের ফলে বুদ্ধের প্রতি রুষ্ট হয়ে তাঁর পাঁচ সঙ্গী বুদ্ধকে ছেড়ে ধর্মচর্চার জন্য এখানে আসেন; পিছন পিছন তাদের খোঁজে আসেন বুদ্ধও। এই পাঁচজন শিষ্যের মধ্যেই সিদ্ধার্থ প্রথম মহাধর্মচক্র প্রবর্তন করেন; বলেন চার সারস্বত সত্যের কথা — দুঃখ আছে, সেই দুঃখের কারণ, দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় এবং শান্তির জন্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। বৌদ্ধধর্মের উন্মেষ এই সারনাথেই; বৌদ্ধদের চারটি প্রধান তীর্থস্থানের মধ্যে একটি; বাকিগুলি লুম্বিনি, কুশিনগর আর বুদ্ধগয়া। মুসলিম হানায় হারিয়ে যায় সারনাথ। বারাণসীর রাজা চেত সিংহের দেওয়ান জগৎ সিং গৃহনির্মাণ সামগ্রী আহরণকল্পে ১৭৯৩-৯৪ সালে খনন শুরু করেন। পেয়ে যান শ্বেতপাথরের কৌটোর মধ্যে রাখা হাড়, সোনা-রুপোর গয়না, মুক্তো। অনেক পথ পেরিয়ে সেটি ঠাঁই পায় বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটিতে। ১৮৩৪ থেকে ১৯০৫-এ স্যার আলেকজান্ডার কানিংহামের নেতৃত্বে ব্রিটিশ প্রত্নতাত্ত্বিকদের খননে নবরূপে উদ্ভাসিত হয় সারনাথ। ফা হিয়েন এবং হিউয়েন সাঙ লিখছেন খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সারনাথ ছিল শিক্ষাসত্র। বুদ্ধ-পরবর্তী যুগে এই

অঞ্চলের নাম হয় সারনাথ; 'সারঙ্গ' অর্থাৎ মৃগ আর 'নাথ' অর্থাৎ প্রভু। জাতককাহিনী আমাদের জানাচ্ছে যে গৌতমবুদ্ধ একসময় এখানেই ছিলেন হরিণদের দলপতি।

পয়লা দ্রষ্টব্য দামেক বা ধামেক স্তূপ, সংস্কৃত ধর্মরাজিকার পালি অপভ্রংশ; খ্রিস্টপূর্ব ২৪৯ সালে সম্রাট অশোক কর্তৃক বুদ্ধের প্রথম শিক্ষাদানের স্থানটিকে স্মরণীয় করে রাখতে নির্মিত, পরবর্তীকালে ৫০০ খ্রিস্টাব্দে সংস্কারিত; ভারতের বৌদ্ধ স্মারকগুলির মধ্যে সম্ভবত সর্বাধিক গুরুত্ব প্রাপ্ত ২৮ মিটার ব্যাস ও ৪৩.৬ মিটার উচ্চতার ইট পাথরের এই সৌধ; সৌধের নিচের দিকের দেওয়ালে গুপ্তযুগের ফুল লতাপাতার চিত্রায়ন, আর ব্রাহ্মী লিপিতে কিছু লেখা। স্তূপের বিবর্তনের ইতিহাসটি ভারি মজার। বুদ্ধপূর্ব যুগে যোগী তপস্বী তাপসদের সমাধিস্থ করা হত বসা ভঙ্গিতে, সমাধিস্থলকে বলা হত চৈত্য। সুগতের মহাপরিনির্বাণের (খ্রিস্টপূর্ব ৪০০) পর তাঁর নশ্বর শরীর দাহ করে চিতাভস্ম আট জায়গায় রক্ষিত হয়; পরবর্তীকালে আরও দু জায়গায় স্মারক গড়ে ওঠে ভস্মাধার ও দেহাবশেষের নিঃশেষিতপ্রায় অঙ্গার ঘিরে। সম্রাট অশোক পরবর্তীকালে অকূর্চের ছোটখাট দেহাবশেষের উপর স্তূপ গড়ে তোলেন। প্রথমযুগের সেই দশ স্মারক তলিয়ে গেছে কালের অতলে, তবে পরবর্তীকালে সারনাথ বা সাঁচি স্তূপ দেখে পণ্ডিতদের মনে হয়েছে পূর্ববর্তী স্মারকের ওপরেই তারা পরবর্তীকালে রূপ পেয়েছে। গোল ঢিপি ঘিরে বড় বড় পাথর, স্তূপের মূল চরিত্র এইই।

ভিক্ষাপাত্র, উত্তরাসজ্ঞ, সজ্ঞাটি, অন্তর্বাস, কটিবন্ধনী, জলছাঁকনি, সূঁচ-সুতা(কাপড় সেলাইয়ের জন্য), ক্ষুর (মস্তক মুন্ডনের জন্য) ব্যতিরেকে ভিক্ষুর ব্যক্তিক সম্পত্তির অধিকার গর্হিত। প্রব্রজ্যাকালে চীবর পাট করে তার উপরে বাটিটি উপুড় করে তারা শিষ্যদের ক্লাস নিতেন, কিছু অর্বাচীনের মতে স্তূপের মূল গড়নটি তার থেকেই পাওয়া। স্তূপের ভিতরে কোনও ফাঁকা জায়গা রাখা হত না, ক্ষেত্রবিশেষে প্রকোষ্ঠ ব্যতিরেকে। অনেকানেক জাপানি ভিয়েতনামি তাইওয়ানি ফিলিপিনি নারীপুরুষকে দেখলাম ধূপ আর দীপ জ্বালিয়ে স্তূপ প্রদক্ষিণ করতে, ধ্যানমগ্ন হতে। আমি অবিশ্বাসী ধর্ম-উদাসীন মানুষ, তবু এই মানুষগুলির মুখে আনন্দের আভা দেখে ভাল লাগছিল।

বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ঘিরে অনেক নির্মাণ, অনেক পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। ছবি তুলতে একটু ওদিকপানে গিয়েছিলাম, ফিরে দেখি শ্রীমতী পাল এক এস্তোনিয়ান দিদিমণির সাথে গল্প জুড়েছেন। গল্প কী করে হচ্ছে সেটাই আশ্চর্যের, কারণ দিদিমণির ইংরাজি শ্রীমতী পালের হিন্দির চেয়েও মর্মান্তিক। লুথেরান প্রটেস্টান্ট বাড়ির মেয়ে বৌদ্ধ হয়েছেন, সেই টানে এতদূর; তাও এই বয়সে। দিদিমণিকে আমার প্রণাম করতে ইচ্ছা হচ্ছিল; কলেজ জীবনে আমি যা করতে চেয়ে করতে পারিনি তিনি সেটাই করতে পেরেছেন বলে। খ্রিস্টান বা মুসলমানেরা যেমন নব্য ধর্মান্তরিতকে সস্নেহে ক্রোড়ে ঠাঁই দেন, হিন্দু বৌদ্ধ জৈন বা শিখরা ঠিক তেমনটি নন, নব্য ধর্মান্তরিত সেখানে কিছুটা অনাহূত বহিরাগত হয়েই রয়ে যায়; অন্তত এক প্রজন্ম। দিদিমণি এত ফরসা যে তার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে গেলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, গালের ত্বকের নিচে নীল শিরা উপশিরা অবধি দেখা যায়।

প্রবেশপথের কাছে টিলার মতো অষ্টকোণবিশিষ্ট চৌখন্ডি স্তূপ - বুদ্ধকে তাঁর শিষ্যরা নাকি এখানে বরণ করেন। পিতা হুমায়ুনের সারনাথ ভ্রমণকে স্মরণীয় করে রাখতে বাদশাহ আকবর স্তূপটির সংস্কার করেন। স্তূপটির নিচের অংশ পাথরের, উপরের ছ'কোণা অংশ ইটের; মোগল আমলে তৈরি। ১৫৮৮ সালে শাহজাদা সেলিম এখানে এক দিনের জন্য এসেছিলেন, তাঁর আগমনকে স্মরণীয় করে রাখতে তদানীন্তন শাসক রাজা তোডরমলের ছেলে গোবর্ধন এই অংশ তৈরি করেছিলেন।

গুপ্তরাজাদের গড়া মূলগন্ধকুঠি বিহার বৌদ্ধদের প্রথম সংঘ। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ৬১ মিটার উঁচু মূলগন্ধকুঠি গড়েছে মহাবোধি সোসাইটি। গর্ভগৃহে ভগবান তথাগতের লাইফ সাইজ সোনালি মূর্তি। শ্রীলঙ্কার অনুরাধাপুরা থেকে বোধিবৃক্ষের চারা এনে রোপণ করা হয়েছে। সেই গাছ আবার আমাদের গয়ার মূল বোধিবৃক্ষের বংশধর, যার তলে বসে শৌদ্ধধন বোধি লাভ করেছিলেন। সম্রাট অশোকের পুত্রকন্যা, মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা ওই গাছের চারা শ্রীলঙ্কায় নিয়ে গিয়েছিলেন। বৃক্ষতলে বেদির ওপর বুদ্ধ মূর্তির সামনে অস্সাজি, মহানামা, ভদ্দিয়, ওয়াপ্পা, কোন্দানয় পাঁচ শিষ্যের মূর্তি। ফ্রেস্কোয় বুদ্ধের জীবন ও জাতকের উপাখ্যান বিম্বিত। বিহারে ঢোকার মুখেই মস্ত বড় এক ঘণ্টা।

বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ, যার তলায় ধ্যান করে সিদ্ধার্থ গৌতম বোধিলাভ করে বুদ্ধ হয়েছিলেন, একটি অশ্বত্থ (Ficus religiosa) বৃক্ষ । বোধিবৃক্ষে জলসিঞ্চন ও বোধিবৃক্ষ বন্দনা বৌদ্ধদের এক পুণ্যকাজ। বৌদ্ধবিহারে বোধিবৃক্ষের উপস্থিতি অপরিহার্য। ধ্যানমগ্নকালে বোধিবৃক্ষ বুদ্ধকে ছায়া প্রদান করায় বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।"যস্সমুলে নিসিন্নো বা সব্বারি বিজযং অকা, পত্তো সব্বঞঞু তং সত্থা বন্দে তং বোধিপাদপং। ইমে এতে মহাবোধি লোকনাথেন পুজিতা, অহম্পি তে নমস্সামি বোধি রাজা নমত্থু তে" - অর্থাৎ- যাতে ভিত্তি করে শাস্তা সকল অরি(শত্রু) সমূহ পরাজিত

করে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন ,সেই পূজার্হ (ভক্তির পাত্র) বোধিদ্রুমকে বন্দনা। জ্ঞানলোকে আলোকিত করা এই মহাবোধি বুদ্ধ কর্তৃক পূজিত, আমিও বন্দনা করছি। হে মহাবোধিরাজ আপনাকে বন্দনা (নমস্কার) করছি।

পাশে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের জাদুঘর। তিব্বতি মন্দির, প্রার্থনা চক্র ঘোরালেই হাতে গরম কাগজের টুকরো বেরিয়ে আসছে, তাতে ওম মনিপদ্মে হুম লেখা। পাশেই কাম্বোডিয়ান মন্দির, বেলেপাথরের অভয়মুদ্রার বুদ্ধ অবাক চোখে চেয়ে আছেন, কারণ কর্তৃপক্ষ মন্দিরটিকে অবৈধ ঘোষণা করে ভেঙে ফেলতে উদ্যত। থাই মন্দিরে বুদ্ধ আশি ফুটের, আর টুরিস্ট লজের পিছনে প্যাগোডা ধাঁচের জাপানি মন্দিরের পরিবেশটি ভারি শান্ত। বার্মিজ মন্দিরটি অতিপুরাতন, ১৯০৮ এ নির্মিত। লাল হলুদ চিনা মন্দিরটি ১৯৩৯ সালের, চিনা লন্ঠনে আর পায়রায় ভরপুর। হিউয়েং সাং কোন পথ ধরে এসেছিলেন তার রুট ম্যাপ দেওয়ালে।

বারাণসীতে ফিরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম, ও মন্দির গমন।

বছর সাতেক আগে যখন আমরা প্রথমবার এই হোটেলে উঠি, হোটেলমালিক বলেছিলেন আমাদের কোনও অফার নেই,

রিবেট নেই, অফ সিজন ছাড় নেই, তবু লোকে আমাদের হোটেলে ওঠে কেন জানেন; আমরা বাবার সঙ্গে ওয়ান টু ওয়ান দেখা করিয়ে দিই। মিথ্যা বললে অধর্ম হবে, তা তারা দেনও। লোকটি কতকটা আমার টাইপের, মন্দিরে যাওয়ার জন্য পোশাক পরিবর্তনের কথা তুললেই বলেন আরে বাপের কাছে ছেলে তো হেগেমুতেই যায়; খালি পেটে যাওয়ার কথা তুললেই বলেন সন্তান না খেয়ে থাকলে বাবা কষ্ট পাবেন, ভরপেট খেয়ে নাও আগে।
বিশ্বনাথ গলির খাবারদাবার পেরিয়ে, কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টনী পেরিয়ে, কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে। ঢোকার মুখেই ধুন্দরাজ গণেশের ছোট মন্দির, কিন্তু পুত্র স্নেহান্ধ মহাদেব নাকি নিয়ম করে দিয়েছেন যে ধুন্দরাজ গণেশের পূজা না করে কেউ তার পূজা করতে পারবে না। আরতি শেষ হয়ে গেছে, আমরা বাবার সঙ্গে ওয়ান টু ওয়ান। রুপোর বেদির উপর ৬০ সেন্টিমিটার উঁচু ও ৯০ সেন্টিমিটার পরিধির শিবলিঙ্গ। তার মাথায় ঘি দুধ দই চন্দন কর্পূর আতপ চাল ফুল বেলপাতা ধূপ দীপ দেওয়ার পর এক ঘড়া করে গঙ্গাজল। মন্দিরটি মোটেও বড় নয়, ১১৯৪ এ কুতুবুদ্দিন আইবককে দিয়ে শুরু, তারপর মন্দিরটি এতবার ভাঙা হয়েছে যে বড় করে আর বানানো হয়ে ওঠে নি। আমারও একবার বাবার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা ছিল। অবসর নিয়েছি, ১৯৮০র যে দিনটিতে কাজে ঢুকেছি সেই দিন থেকে এই দিনটির প্রতীক্ষায় ছিলাম। রোজ সকালে গাইতাম 'ভালোয় ভালোয় বিদেয় দে মা আলোয় আলোয় চলে যাই'। অবশেষে শ্রাবণের বৃষ্টিধারার মত ঈশ্বরের অপার দাক্ষিণ্য নেমে এল আকাশ হতে, পাপমুক্তি ঘটাতে। ঘটনাবিহীনভাবে অবসর নিতে পারার জন্য বাবার তো একটা ধন্যবাদ প্রাপ্য হয়।

পাশেই অন্নপূর্ণার মন্দির; নারায়ণ সান্যালের ভাষ্য অনুযায়ী প্রতিষ্ঠাতা নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার। আকবরের সেনাপতি মানসিংহ যখন যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যকে টিট করতে বঙ্গভূমে, তার সেনাবাহিনীকে রসদ সরবরাহ করে ভবানন্দের উত্থান। পরিবারটি তাদের স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার চরিত্র বজায় রেখেছিল দেড়শো বছর, ১৬০৬ – ১৭৫৭। পলাশীর যুদ্ধে এনারা ক্লাইভের খোঁয়াড়ে শোভা পাচ্ছিলেন, তাদের তৈলনিষেকে অভিভূত ক্লাইভ এনাদের নাকি কামান উপহার দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধবাদীদের নেতৃত্ব দেন এনারাই।

কবি কালিদাস বলেছেন 'অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ'। নাগারা স্থাপত্যের বর্তমান মন্দিরটি অষ্টাদশ শতকে পেশোয়া বাজিরাও কর্তৃক নির্মিত। এখানে একবার দেখা করে যেতে পারলে তার নাকি সারাজীবন খাওয়ার চিন্তা থাকে না। শিব ও পার্বতীর সংসারের ঘোর দারিদ্র্য। পার্বতী তখনো অন্নপূর্ণা হয়ে ওঠেননি। পার্বতী একদিন শিবকে কথায় কথায় বললেন মনের কথা; দারিদ্র্য তাঁর আর সহ্য হয়না। মাথার চুল ও সর্বাঙ্গে তেল না পড়ে রুক্ষ, নিত্য সিদ্ধিপাতা বেটে হাতে কড়া। এক পুত্র গজানন চারহাতে খায়; অপরপুত্র ষড়ানন ময়ূর নিয়ে খেলে বেড়ায়। সংসারে অন্ন নেই। পার্বতীর হাহুতাশ শুনে মহাদেব ভিক্ষায় বেরোলেন। পার্বতী আর কি করেন, বাপের বাড়ি যাবেন তার উপায় নেই, কারণ স্বামী ধনহীন হলে বাপের বাড়িতে মেয়েদের কোনো সম্মান নেই। পরিশেষে তিনি অন্নপূর্ণা রূপ ধারণ করে বিশ্বের সমস্ত অন্ন একত্র করে নিজের সংগ্রহে রাখলেন। এদিকে মহাদেব আর ভিক্ষা পান না। অবশেষে তিনি লক্ষ্মীর কাছে গেলেন অন্নের জন্য। লক্ষ্মী তাঁকে বললেন 'অন্ন তুমি কোথায় পাবে? সব অন্ন তো তোমার ঘরণীর কাছে'। বিস্মিত মহাদেব ঘরে ফিরে দেবীর কাছে ভিক্ষা চাইলেন।
অন্নপূর্ণা মন্দিরের প্রসাদ একমুঠো চাল। বাড়ি ফিরে ওই চাল তোমার চালের ভাঁড়ারে মিশিয়ে দেবে, মা অন্নপূর্ণার অনুগ্রহে তোমার জীবনভর ভাতের অভাব হবে না। আখ্যানটিতে কি ভারতীয়দের দুবেলা আহারপ্রাপ্তি বিষয়ক প্রগাঢ় নিরাপত্তাহীনতা সূচিত? আমরাই তো ছিয়াত্তরের মন্বন্তর আর পঞ্চাশের আকাল পেরিয়ে এসেছি, ইহজীবনেই দেখেছি ষাটের সত্তরের দশকের কর্ডনিং, পাঁচ টাকা কিলো চাল – বাঙালির গম যব মাইলো ভক্ষণ। সম্ভবত সেই জনইতিহাসই বিধৃত এই প্রথায়। আমাদের মাতৃস্থানীয়েরা যে বলেন 'বাবা এলি কিছু মুখে না দিয়ে যাস না' – তার পিছনেও সম্ভবত এই একই অনিশ্চয়তা বোধ কাজ করে। কে জানে বেচারার সকাল থেকে কিছু জুটেছে কি না – তার চেয়ে বাবা এক গাল খেয়ে যা। একদা এক মেক্সিকান প্রৌঢ়ার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁর মধ্যে এই অভ্যাসটি দেখেছিলাম - দেখা হলে কিছু না খাইয়ে ছাড়তেন না। হতে পারে সেই একই মানসিকতা – দুটোই গরিব দেশ, গরমের দেশ!

পাশেই সাক্ষী বিনায়ক খোলা আকাশের নিচে বসে আছেন। ইনি আপনার কাশী বিশ্বনাথ দর্শনের সাক্ষী। চত্বরের মধ্যেই জ্ঞানবাপি মসজিদ বা আলমগিরি মসজিদ, মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে এই মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। ১৭৮০ সালে হিন্দু মারাঠা রানি অহল্যাবাই হোলকার কাশী বিশ্বনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণ করেন। নবনির্মিত মন্দিরটি মসজিদের পাশেই নির্মিত হয়। দুইয়ের মাঝে কাঁটাতারের বেড়া; মধ্যিখানে জ্ঞানবাপি কূপ; আক্রমণের সময় প্রধান পুরোহিত স্বয়ং জ্যোতির্লিঙ্গটি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সেটি নিয়ে এই কুয়োয় ঝাঁপ দিয়েছিলেন বলে বিশ্বাস। মন্দিরচত্বরে ছোটো ছোটো অনেকগুলি মন্দির - কালভৈরব, দণ্ডপাণি, অবিমুক্তেশ্বর, বিষ্ণু, বিনায়ক, শনীশ্বর, বিরূপাক্ষ ও বিরূপাক্ষ গৌরীর।

- ক্রমশঃ -

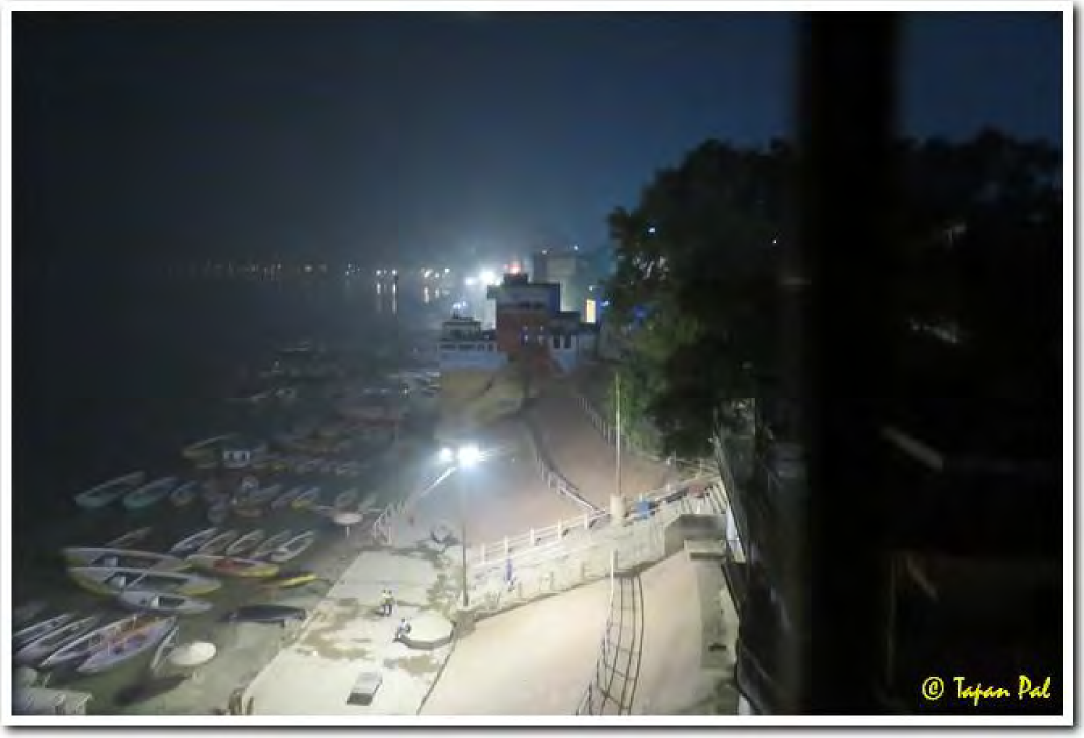

~ বারাণসীর আরও ছবি ~

হিসাবশাস্ত্রের স্নাতকোত্তর শ্রী তপন পাল West Bengal Audit & Accounts Service থেকে অবসর নিয়েছেন সম্প্রতি। তাঁর উৎসাহের মূলক্ষেত্র রেল - বিশেষত রেলের ইতিহাস ও রেলের অর্থনীতি। সেবিষয়ে লেখালেখি সবই ইংরাজিতে। পাশাপাশি সাপ নিয়েও তাঁর উৎসাহ ও চর্চা। বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য শ্রী পালকে বাংলা লিখতে শিখিয়েছে 'আমাদের ছুটি'। স্বল্পদূরত্বের দিনান্তভ্রমণ শ্রী পালের শখ; কারণ 'একলা লোককে হোটেল ঘর দেয় না।'

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ফিরে দেখা সেই কেদার

অরুণাচল চ্যাটার্জি

~ কেদারের আরও ছবি ~

চড়াই ভাঙতে ভাঙতে বার বার মন ফিরে যাচ্ছিল সেই চৌদ্দ বছর আগের দিনগুলিতে। তখন আমারও বয়স চৌদ্দ ছিল, চড়াই ভাঙতে এতটা কষ্ট হয়নি। আবার এটাও হতে পারে, নতুন যে রাস্তা এখন তৈরি হচ্ছে (যার কাজ তখনও শেষ হয়নি), তার দূরত্ব বা চড়াই আগের থেকে বেশি হয়েছে। রাস্তা ছিল ১৪ কিমি, গৌরীকুণ্ড থেকে কেদারনাথ, মাঝে দুদিক থেকেই ৭ কিমি দূরত্বে ছিল রামওয়াড়া চটি; যার অস্তিত্ব এখন আর নেই। রামওয়াড়া থেকে কিছুটা কেদারের দিকে এগিয়ে এলে আরও একটা চটি পড়ত - গরুড় চটি, সে চটির এখন আর প্রয়োজন পড়ে না, কারণ রাস্তার পরিবর্তন। একটা সময় ছিল যখন সারি সারি বাস দাঁড়িয়ে থাকতো গৌরীকুণ্ডের ওই কম পরিসরে; বাস, ট্রাক, প্রাইভেট গাড়ির ভিড়ে প্রায়শই ভয়ানক যানজট লেগে থাকতো। আর হরিদ্বার বা হৃষিকেশ থেকে সরাসরি ভুকহরতাল বা গাড়োয়াল মন্ডলের বাসে করে পৌঁছে যাওয়া যেত গৌরীকুণ্ডে। মনে পড়ে ছোট্টবেলায় যখন বাবা-মার সঙ্গে গিয়েছিলাম, বাস ধরেছিলাম হৃষিকেশ থেকে খুব ভোরে; আর বিকেল নাগাদ পৌঁছেছিলাম গৌরীকুণ্ডে। জায়গাটা পুরো মেলার মতন ছিল, মানে এত লোকজন, দোকানপাট সব গমগম করত, পাশাপাশি (সমান্তরাল) দুটো গলি ছিল, তার দুদিকে সারি দিয়ে দোকান, পর্যটকদের জন্য হোটেল ইত্যাদি। রাস্তা দিয়ে ঠিকভাবে চলার জো ছিল না। মনে পড়ে সুপ্রিয়া দেবীর হোটেলে পুরোদস্তুর বাঙালি খাবার খাওয়া, উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান, আর খরস্রোতা মন্দাকিনীর আওয়াজ। সে আওয়াজ সারাদিন সঙ্গী ছিল। এই চৌদ্দ বছরে আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু একটা ব্যাপারের আর কোনও পরিবর্তন হয়নি - তা হল হিমালয় প্রীতি। সেইবার কেদারনাথের পথের যে দৃশ্য দেখেছিলাম তখনই ঠিক করেছিলাম আবার ফিরে আসতে হবে। তাই এবার সস্ত্রীক চললাম আবার কেদারনাথ দর্শনে। এর মধ্যে ঘটে গেছে ভয়ঙ্কর এক দুর্ঘটনা, যা সবার জানা, ২০১৩-র জুনে সাংঘাতিক মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে চোরাবালি তাল ফেটে গিয়ে যে ধ্বংসলীলা চলেছিল, তাতে মন্দাকিনীর স্রোত পরিবর্তন থেকে তার পথের যাবতীয় রূপরেখার আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। প্রাণহানিও যে কত হয়েছিল তা তো সবারই জানা। এই ঘটনার পরের বছর অর্থাৎ ২০১৪-তে কেদারনাথ যাত্রা প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল পর্যটকদের জন্য। ২০১৫ -তে আবার চালু হতে এবছরই যাবার মনস্থির করে ফেললাম। উত্তরাখণ্ডের রাজ্য সরকার পর্যটকদের জন্য একটি নতুন ধরনের পরিচয় পত্র চালু করল, যাতে গাড়োয়াল-এর বিভিন্ন জায়গায় যাবার ছাড়পত্র ও সঙ্গে পর্যটকের যাবতীয় তথ্যাদি নথিভুক্তকরণ করা হল। সেই অনুযায়ী আমরা হৃষীকেশ-এর বাসস্ট্যান্ডের সামনের একটি হোটেলে গিয়ে উঠলাম। সুবিধা এই যে, সকালে কখন কোন বাস ছাড়ছে তার একটা ধারণা তৈরি হবে এবং ছাড়পত্রটিও করিয়ে নেওয়া যাবে। ভোরের একটি বাস ধরলাম, গন্তব্য গৌরীকুণ্ড। খুব ভোরে অন্ধকার থাকতেই বাস ছাড়ল। ছাড়ার পরই কিছু কথা কানে এল। বুঝলাম কন্ডাক্টার গৌরীকুণ্ড বলে বাসে তুলে, এখন বলছে রুদ্রপ্রয়াগ অবধি যাবে। কী বিপত্তি! অনেক বাক-বিতন্ডা করেও যখন বুঝলাম আর কিছু হবার নয়, তখন ছেড়ে দিলাম আর ভাবতে থাকলাম এরপর কী করে গৌরীকুণ্ড পৌঁছাব। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ রুদ্রপ্রয়াগ এসে পৌঁছলাম। বাসের টিকিট বাবদ অতিরিক্ত টাকা ফেরত নিয়ে আর লটবহর নিয়ে খুঁজতে লাগলাম কোন্ বাস গৌরীকুণ্ড যাবে। কিন্তু কোনও বাস-ই পেলাম না যেটা ওখান থেকে সরাসরি গন্তব্যে নিয়ে যাবে। অগত্যা ট্রেকার-এ আরও অনেকের সঙ্গে সওয়ারি হয়ে চললাম গুপ্তকাশীর উদ্দেশ্যে। যা বুঝলাম, কোনও গাড়ি-ই আর সরাসরি গৌরীকুণ্ড যায় না। গুপ্তকাশী পৌঁছে আর একটি ট্রেকার করে সোনপ্রয়াগ। তখন ভাবছি আর কত ভেঙে ভেঙে যেতে হবে। এদিকে সময় আর খরচ দুটোই বেড়ে চলেছে। গাড়ি পেলেও, সে যতক্ষণ না ভর্তি হয়, ছাড়তেই চায়না। সন্ধ্যের মধ্যে গৌরীকুণ্ড পৌঁছতেই হবে। ২০১৩ দুর্ঘটনার জের যে বেশ ভয়ানক হয়েছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে। বাসের কন্ডাক্টারকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম যে বাস চলার উপযোগী রাস্তা আর নেই, তাই বাস ওপথে এখন আর যেতে পারবে না। পাশাপাশি পর্যটক সংখ্যাও অনেক কমে গেছে। যাই হোক অনেক কষ্ট করেই দুপুর নাগাদ গিয়ে পৌঁছলাম সোনপ্রয়াগ-এ। পৌঁছে দেখলাম নানাদিকে অবস্থার পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে; নানারকম ক্যাম্প করা হয়েছে, পর্যটকদের সহযোগিতার জন্য।

গিয়ে জানা গেল এখান থেকে কোনও গাড়ি আর আগে যাবে না। পর্যটকদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু শেয়ার জিপ (জনপ্রতি কুড়ি টাকা) বিকাল চারটের সময় সোনপ্রয়াগ থেকে গৌরীকুণ্ড-এ পৌঁছে দেবে। ওখানকার পুলিশই এই ব্যবস্থা করেছে কারণ সামনে কিছু বিপজ্জনক জায়গা আছে, সেগুলো সাবধানে পার করে দেওয়া হচ্ছে কড়া নজরদারিতে। রাস্তা বলে কিছু নেই, শুধুই ধ্বংসাবশেষ। তার মধ্য দিয়ে রাস্তা করা হচ্ছে। যে ব্রিজটা সোন নদীর উপর ছিল, সেটা জলের তোড়ে ভেসে গেছে। নতুন একটা টেম্পোরারি ব্রিজ দিয়ে সীমিত সংখ্যক গাড়ি চালানো হচ্ছে।

এত আগে পৌঁছে গিয়ে কী আর করা, শুধু বসেই সময় অতিবাহিত করা ছাড়া আর কোনও গতি নেই। সরকারী ক্যাম্পে আবার বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বিকেল তিনটের সময় ডাক্তারের কাছে প্রেসার, পাল্স পরীক্ষা করিয়ে, প্রয়োজনীয় কাগজ সংগ্রহ করে অপেক্ষা করতে থাকলাম কখন সেই জীপ আসবে তার জন্য। এদিকে আবহাওয়ার অবনতি হতে থাকল; শেষে বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেল। ভাবছি রাস্তা আবার না খারাপ হয়ে যাত্রা ভন্ডুল হয়। ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপতে আরম্ভ করলাম, সঙ্গে রাখা গরম জামার আশ্রয় নিতেই হল। হঠাৎ শুনি জীপের আওয়াজ। পড়িমড়ি করে রুকস্যাক কাঁধে চাপিয়ে ছুটলাম দুজনে ওই গাড়ির উদ্দেশ্যে। এমন অবস্থা যেন দৌড়ে গিয়ে গাড়ির সীট না পেলে আমাদের যাওয়াই হবে না। ব্যাপারটা কিছুটা তাইই ছিল, পরে বুঝেছিলাম। মাত্র তিন-চারটে জীপ, তার মধ্যেই দখল করে উঠে পড়তে হবে।

ব্যাপারটা খারাপই লেগেছিল, কিন্তু কী আর করা, 'যস্মিন দেশে যদাচার'। ব্যাগগুলো তো সব গাড়ির মাথায় তুলে দিয়েছিলাম, এদিকে বৃষ্টিও পড়ছে। ড্রাইভার ঠিকমত প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকেছিল কি না সেই চিন্তাটা ছিলই। জামা-কাপড় ভিজলে এই ঠাণ্ডায় মুশকিলে পড়তে হবে, সে অভিজ্ঞতা আগে হয়েছে। যাই হোক শেষমেষ গৌরীকুণ্ডে উপস্থিত হলাম। গাড়ি থেকে ব্যাগ নামিয়ে আগের চেনা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাবার উপক্রম করতেই সম্বিত ফিরে এল। এ কোন্ গৌরীকুণ্ড! এরকম তো আগে ছিল না। পড়ন্ত বিকেল, মুখভারী আকাশ যেন আমার মনের ও বাস্তবিক পরিস্থিতিরই প্রকাশ বলে মনে হয়েছিল। গলি দিয়ে ক্রমশ এগোচ্ছি আর অতীত দৃশ্যপট মনের মধ্যে ভেসে উঠছে। এখানে তো এটার দোকান ছিল, ওই তো ওখানটায় এই খাবারের দোকানটা ছিল; এখন শুধুই ভাঙা দেওয়াল, আর কাদা ও পাথরে ভর্তি কিছু খোপ। মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ মা! উষ্ণপ্রস্রবণটাই তো নেই, আর আমার খুব প্রিয় সুপ্রিয়া হোটেল - সে তো এখন নদীর অংশ। পুরো গৌরীকুণ্ডটাই এখন শ্মশানস্বরূপ হয়ে পড়েছে।

"ও বাবু, ইধার আইয়ে" - চমকে স্মৃতি থেকে বাস্তবে। লোকটি সেই সোনপ্রয়াগ থেকে আমাদের পিছু নিয়েছে, নিজের হোটেলে নিয়ে তুলবে বলে। কখন যে গাড়ির পাশে ঝুলে পৌঁছে গিয়েছিল, খেয়ালই করিনি। সেই গৌরীকুণ্ডে নামার পর থেকে আবার পিছু নিয়েছে। হয়ত অনেক কিছু বিজ্ঞাপনও দিয়ে থাকবে নিজের হোটেল সম্পর্কে, আমি অত খেয়াল করিনি। তার হোটেলের ঘর দেখেশুনে নিয়েই ফেললাম। ঘরটা বেশ পরিষ্কার, তাই আর বেশি ঝামেলা করিনি, 'অফ -সিজন' -এ ওদেরও খুব অসুবিধার মধ্যে চলছে। এখন তো লোক আসাও কমে গিয়েছে আর এখন অক্টোবর মাস, আর কিছুদিন পরে কেদারনাথের শিব নেমে আসবেন উখিমঠ-এ, তখন তাঁর পুজো হবে সেখানেই, সারা শীতকাল। একটু ফ্রেশ হয়েই বেড়িয়ে পড়লাম গৌরীকুণ্ড-এর আশ-পাশটা দেখতে। কেদারনাথের দিকে যে পথ ওপরে উঠে গিয়েছে, তার ঢালে চলছে নতুন করে পাড় বাঁধানো বা নতুন কোনও কনস্ট্রাকশনের কাজ। পাশ দিয়ে সবুজ জল নিয়ে বয়ে চলেছে মন্দাকিনী। পরিবর্তন হয়নি সেই আওয়াজের যা অনেক বছর মনের মধ্যে বসেছিল। আবার তার পুনরুজ্জীবন ঘটল। মাঝে দু-একটা চায়ের দোকান, তার একটায় বসলাম। বাকী সবার চোখ-ই আমাদের দিকে; আর তো কোনও পর্যটক ছিল না দোকানে। চা আর প্রজাপতি বিস্কুট খেয়ে খানিক গরম হয়ে নিলাম। হোটেল থেকে বেরোবার আগে বলে রেখেছিলাম রুটি, আলুজিরা আর ডাল বানিয়ে রাখতে রাতের আহারের জন্য। হাতে আর একটু সময় ছিল তাই কিছুটা গৌরীকুণ্ড বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে এলাম। নদীর ধারের বাড়িগুলো আধ-ভাঙা অবস্থায় ঝুলছে নদীর ওপর। ঢালের বাড়িগুলো হেলে পড়েছে গলির ওপর, রাস্তার পাশের তলাগুলো সব ইট-কাঠ, কাদায় ভর্তি। দেওয়ালে পুরানো অনেক কিছুর স্মৃতি বুঝিয়ে দিচ্ছে আগের অবস্থা। জায়গাটা তো চারিদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা, সন্ধে নেমে আসছে খুব তাড়াতাড়ি। কিছু ছবি স্মৃতিস্বরূপ তুলে রাখলাম, আর মিতাকে পূর্বের অবস্থা ও অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে দিতে ফিরে চললাম হোটেলের দিকে।

পরেরদিন খুব ভোরে যাত্রা শুরু করতেই হল, কারণ যে ভাবে আমরা গৌরীকুণ্ড পৌঁছেছিলাম, তাতে একটা আশঙ্কা ছিল যে সামনের রাস্তার কী পরিস্থিতি হবে বা কতটা সময় লাগবে পৌঁছাতে। শুরুর দিকে চড়াই ভাঙতে একটু বেশিই কষ্ট হয়, যারা নিয়মিত পাহাড়ি রাস্তায় ট্রেকিং করেন, তারা নিশ্চয় এর কারণটা বুঝবেন। ধীরে ধীরে উচ্চতার সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খেয়ে শরীর তখন অতটা কষ্ট আর অনুভব করে না। আবহাওয়া আজ খুব পরিষ্কার লাগছে। একটা কথা বলে নেওয়া ভালো, পাহাড়ে সকালের দিকে আবহাওয়া সাধারণত খুব পরিষ্কার থাকে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘলা হয়ে পড়ে, আর সঙ্গে বৃষ্টিও হতে পারে। পাহাড়ি বৃষ্টি, বর্ষাকাল বাদ দিয়ে, ক্ষণস্থায়ী হয়, পরিবেশ খুব তাড়াতাড়ি আবার পরিষ্কারও হয়ে যায়। পূর্বে যে জায়গাটা রামওয়াড়া চটি ছিল, এখন তার কোনও অস্তিত্ব চোখেই পড়ল না, কিছুটা এগিয়ে চোখে পড়ল রাস্তার ডানদিকে অর্থাৎ মন্দাকিনীর দিকেই একটা ছোট্ট হেলিপ্যাড। অনেকদিন আগেই হেলিকপ্টার-এ কেদার যাত্রা শুরু হয়েছিল। এখন গুপ্তকাশী থেকে ৭৫০০/- টাকায় যাতায়াত কেদার দর্শনের, মাত্র কুড়ি মিনিটে।

যাঁরা হেঁটে দৃশ্য উপভোগ করতে করতে কেদারদর্শনে চলেছেন, তাঁদের জন্য এ এক মানসিক বিড়ম্বনা। আপনি কষ্ট করে উঠছেন, আর কিছু লোক হুশ করে পৌঁছে যাচ্ছে "গন্তব্যে"। অবশ্য গন্তব্য পৌঁছানোই যে তাদের উদ্দেশ্য, আমাদের সেটা ছিল না। কিন্তু ওই গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে চারিদিক কাঁপিয়ে হেলিকপ্টারের আওয়াজ বড়ই বেমানান। পাহাড়ের যে অংশ

বালিপাথরের, সেখানে এই প্রচণ্ড আওয়াজ ভূমিধ্বসের সৃষ্টি করতে পারে। পথে মানুষের থেকে ঘোড়ার সংখ্যাই বেশি, তারাই সিমেন্ট, ইট, কাঠ, লোহার রড ওপরে বয়ে নিয়ে চলেছে। নতুন করে কেদার সাজাবার লক্ষ্যে। ভালোভাবে দৃশ্য উপভোগ করাই দায়। তবে ঘোড়া বা খচ্চর আগেও ছিল, কিন্তু তখন তারা মানুষবহনের কাজটাই বেশি করত। পথে যেতে যেতে ২০১৩ -এর ধ্বংসলীলার চিহ্ন যথেষ্টই চোখে পড়ছে, প্রায় কিলোমিটার ছয়েক হাঁটার পরই নদী অতিক্রম করতে হল। আগে যে পথ মন্দাকিনীকে ডানহাতে রেখে যেত, এখন গৌরীকুণ্ড থেকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তা বাঁ-হাতে রেখে চলেছে। ব্রিজটি একেবারেই টেম্পোরারি, মূল রাস্তা প্রায় নদীর কাছে নেমে এসেছে, তারপর ওপারে গিয়ে আবার পাকদণ্ডী পথ ওপরের দিকে উঠে চলেছে।

দেখলাম এই ব্রিজের কিছু আগে নদীখাতের মাঝামাঝি জায়গায় নতুন একটা ব্রিজ তৈরি হচ্ছে। নদী পার হওয়ার সময় ব্রিজের ওপর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আশপাশটা ভালো করে দেখছি, পুরনো রাস্তাটা পুরো ধ্বসে গেছে আর পাহাড়ের অবস্থাটাও সেরকম নয় যে ওখানে আবার রাস্তা তৈরি করা যাবে। তাই হয়ত নদী পেরিয়ে এ পাশে নতুন রাস্তার ব্যবস্থা। এই পাশের পাহাড়ের ঢাল বেয়ে কিছুটা এগিয়ে একটা বিস্তীর্ণ উপত্যকার সৃষ্টি করেছে। সেখান দিয়েই এঁকেবেঁকে রাস্তা উঠে গিয়েছে কেদারের দিকে। নদী পেরিয়ে সামনে খুব চড়াই ভাঙতে হল, মনে হচ্ছিল দম বেরিয়ে যাবে, সঙ্গের রুকস্যাকটাও বড্ড ভারী ছিল। আগে পুরো রাস্তার এতটা চড়াই ছিল না। এখন অনেকটা বেড়ে গেছে। এগোচ্ছি আর এপার থেকে ওপারের রাস্তাটা বার বার দেখছি, মধ্যে মধ্যে অনেকখানি করে ল্যান্ডস্লাইড হয়ে রাস্তার কোনও চিহ্নমাত্র রাখেনি। দূরে একটা চটি নজরে এল, লাল রঙের টিনের চাল, কিছু ক্যাম্পের মত আছে মনে হল। পথে পানীয় জলের পাইপও বসানো আছে। কিছু নতুন ছাউনিও করেছে। ভালো লাগল, খুব তাড়াতাড়ি সরকার পর্যটকের সুবিধার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে দেখে; এই শীঘ্রতার একটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণও আছে, তা হল, উত্তরাখণ্ডের বেশিরভাগ মানুষ এই পর্যটনশিল্পের উপর নির্ভরশীল, সঙ্গে সরকারের আর্থিক মুনাফাও রয়েছে। এই নতুন চটিটার নাম হল লীনচটি। খানিক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু হল চড়াই ভাঙা। আমরা খুব ধীরগতিতেই চলছিলাম, চারিদিক দেখা আর তা ক্যামেরাবন্দী করার 'বদ অভ্যাসের' কারণে। ফলতঃ বেলা বাড়ছিল, সঙ্গে আবহাওয়া খারাপ হওয়ার আশঙ্কাও। মেঘলা হচ্ছে মাঝে মাঝেই, আবার পরিষ্কারও হয়ে যাচ্ছে। সামনের নীলাকাশের 'ব্যাকড্রপ' -এ কেদারনাথ শৃঙ্গ দৃশ্যমান হচ্ছে প্রায়ই। এরই তো টানে পথ চলা, সঙ্গে কেদারডোম, আরও কত কত পিক্। অনেকটা চড়াই ভাঙার পর বহুদূরে একটা সবুজ উপত্যকা দেখা গেল, তার বুক চিরে এঁকেবেঁকে পথ উঠে গেছে আরও ওপরে, যদিও মাঝে কিছু উতরাইও আছে। মন বলছে আর উতরাই নয়, কারণ আবার যে উঠতে হবে। খালি মনে হয়, এ তো ১৪ কিমি পথ নয়। দূরত্ব কি তাহলে বেড়ে গেলো নাকি!

অনেকখানি চড়াই ভেঙে উপত্যকার একটা ধার ঘেঁষে পিছনে ফিরে তাকাই, উফ্ কী অপূর্বই না লাগছে! যে পথ, উপত্যকা আর ব্রিজ অতিক্রম করে এসেছি, তা ওপর থেকে সবই দৃশ্যমান। মন্দাকিনীর উপত্যকাও এক অপরূপ রূপ নিয়েছে সূর্যের হাল্কা আলোয়। এইখানে কিছুক্ষণ যাত্রাবিরতি নিয়ে, একটু পেটপুজো করে নতুন উদ্যমে আবার চলা, সামনে কেদারনাথ গিরিশৃঙ্গ। তারই কাছে পৌঁছতে হবে। অনেকটা খাড়া চড়াই ভাঙার পর সবুজ উপত্যকার অংশ কিছু সমতলের মত হয়েছে, মন বলছে আর একটু, তারপরই পৌঁছে যাব, বৃষ্টি আসার আগেই। আমরা ধীরে সুস্থে চারিদিক উপভোগ করতে করতে এগিয়ে চলেছি। একটা স্বপ্নপূরণের খুশি মনের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে, মিতাকে এই পথে নিয়ে আসার আর এই দৃশ্য দেখানোর অনেকদিনের সখ ছিল, তা পূরণ হচ্ছে। হাল্কা উঁচু-নীচু ঢালের বাঁদিকে একটা বোর্ড চোখে পড়ল, সেটা পড়েই মনটা একটু হালকা হল, এই তো আর মাত্র ১ কিমি, এসে পড়েছি।

কিছুটা এগিয়ে ডান হাতে চোখে পড়ল জি এম ভি এন-এর করা ছোট ছোট ক্যাম্প বা রিসর্ট এর মতো। একটু খোঁজখবর নিলাম রাত্রিবাস আর খাবারের ব্যাপারে। মন বলছিল আর একটু এগিয়ে নিশ্চয়ই আরো কিছু এরকম পাবো, এতটা পিছনে থাকলে খুব সুবিধা হবে না। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানতাম যে মন্দিরের আশে পাশে অনেক থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা পাওয়া যাবে, কিন্তু এও মনে হল বর্তমান পরিস্থিতি যে অন্যরকম। সবই নতুন 'কনস্ট্রাকশন'। আর কিছুটা এগোতে মূল হেলিপ্যাড

চোখে পড়ল, বাঁদিকে, অনেকক্ষণই হেলিকপ্টারের আওয়াজ পাইনি; হয়তো এ বেলায় তা বন্ধ হয়ে যায়। পরিবেশ খুবই মেঘলা হয়ে আছে, মাঝে মধ্যেই মেঘে চারিদিকটাকে মুড়ে দিচ্ছে, আবার হাওয়ার দাপটে তা কেটেও যাচ্ছে। হেলিপ্যাডের পাশেই আবছা চোখে পড়ল সারি সারি টেন্ট, বেশ বড় বড়। কাছে যেতেই চোখে পড়ল একটা অফিসঘর, ক্যান্টিন, ইত্যাদিও আছে। জানলাম ক্যাম্পটা NIM -এর (Nehru Institute of Mountaineering) সদস্যরাই চালাচ্ছে। একশ টাকা জনপ্রতি একরাতের জন্য হিসাবে, টেন্ট এ বেড ভাড়া দেওয়া হয়, সঙ্গে স্লিপিং ব্যাগও। আর দুবার ভাবতে হয়নি। একটি টেন্টে দশ জন থাকতে পারে। আমরা 'ফ্যামিলি' বলে, দেখেশুনে একটা টেন্ট দেওয়া হল, লাঞ্চের সময় শেষ, তাই ক্যান্টিনে অন্যকিছু খাবারের জন্য বলে রাখলাম। ওদের একজন টেন্টটা দেখিয়ে দিল। ঢুকে দেখলাম, দুটো সারিতে পাঁচটা করে ক্যাম্প কট, প্রত্যেকটিতে একটা করে ভালো গদি, স্লিপিং ব্যাগ আর বালিশ রাখা আছে। একপাশে পাঁচটা বেড ভর্তি ছিল, আমরা অন্য পাশের দুটো বেড দখল করলাম। এই ব্যবস্থা পেয়ে আমাদের তো আর আনন্দ ধরে না। এরকম পাবো তো ভাবিও নি। যাক, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে, ঠাণ্ডার জন্য উপযুক্ত পোষাক পরে, ক্যান্টিনের দিকে চললাম।

ঠাণ্ডায় গরম গরম চায়ের যে কী মহিমা, তা আর বলার নয়। কনকনে হাওয়ার দাপটে ঠাণ্ডাটা বেশ জাঁকিয়েই পড়েছে। তখনও সন্ধ্যে হয়নি। তাই চা-টা খেয়ে আমরা চললাম মন্দির প্রাঙ্গণের দিকে। নতুন বাঁধানো রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি, একপাশে ইট তৈরির কাজ হচ্ছে, কোথাও বোল্ডার ভাঙার কাজ চলছে। রাস্তার আশেপাশে আরো কিছু ক্যাম্প চোখে পড়ল। মন্দাকিনীর নদীখাত বলে এখানে কিছু নেই। নদীর ওপারে ভাঙা ঘরবাড়ি চোখে পড়ছে, কিছু না ভেঙে পড়া বাড়িও রয়েছে, কিন্তু সেখানে আর পর্যটক যায় না, যাওয়ার দরকার পড়ে না। আগে নদীর ওই পাড়েই বসতি ছিল আর একটা পুল পেরিয়ে এপারে আসতে হত মন্দিরদর্শনে। মন্দাকিনী আগে মন্দিরের বাঁদিক দিয়ে বয়ে যেত এবং ইচ্ছে করলেই সেই নদীতে নেমে মন্দাকিনীর সবুজ কনকনে ঠাণ্ডা জল স্পর্শও করা যেত। দেখলাম মন্দিরটা একটা দ্বীপের মত অংশে রয়েছে, আর তার দুপাশ বেয়ে মন্দাকিনীর স্রোত বয়ে চলেছে। নদী নতুন খাতে বওয়ার সময় যে কী ভয়ানক ধ্বংসলীলা চালিয়েছে, তার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করছি আর মনটা বিষাদে ভরে উঠছে। '১৩-র এই ঘটনায় চোরাবালি তাল-এর জলরাশি পুরোটাই মন্দাকিনীতে এসে পড়ে, আর তার ফলস্বরূপ যে হড়কা বানের সৃষ্টি হয়, সঙ্গে আকাশভাঙা বৃষ্টি তো ছিলই, তাতেই নদীর দিক পরিবর্তন। মন্দিরের আশেপাশের যাবতীয় বাড়িঘরের অস্তিত্ব বলতে শুধুই ভাঙাচোরা দেওয়াল আর বেরিয়ে থাকা রড।

শুধু মন্দিরটাই বেঁচে গেছে একটা বড় বোল্ডারের জন্য, এমনটাই মনে করা হয়। মন্দিরের ঠিক পেছন দিকে এক মানুষ উঁচু আয়তাকার পাথর, পাহাড়ের গা থেকে জলের স্রোতে গড়াতে গড়াতে এসে থমকে যায়। আর সেটাই নাকি ভয়ঙ্কর জলস্রোতকে রোধ করে, মন্দিরের দেওয়ালকে বাঁচিয়ে দেয়। এই বিপুল জলরাশি, প্রচুর পরিমাণে বালি, পাথর, নুড়ি নিয়ে হাজির হয় ওই চত্বরে। বান-এর জল বেরিয়ে যাওয়ার পর পুরো অঞ্চলটাই চাপা পরে বালি, মাটি পাথরে। আমরা এখন যেখান দিয়ে হেঁটে চলেছি, সেটা আগের একতলার ছাদ-এর সমান। দেখতে পাচ্ছি বাড়িগুলোর একতলা সব চাপা পড়ে গেছে। মন্দির প্রাঙ্গণে ওঠার তাই আর কোনো সিঁড়ির দরকার পড়ে না।

মন্দিরের বাঁদিকে ভারত সেবাশ্রম সংঘের বাড়ি ছিল মনে পড়ে। সবই এখন মাটির নিচে, যেদিকেই তাকাই সেদিকেই দেখি হয় ভাঙা বাড়ির দেওয়াল, মাটি থেকে বেরিয়ে আসা ঢালাইয়ের রড বা ভাঙাচোরা আসবাবপত্র। মাটির নিচে যে কত জনের সমাধি রয়েছে তা বলা মুশকিল। মন্দিরের পাশে এখন আর কোনো দোকান নেই। কিছু লোক মাটিতে বা ছোট্ট টেবিলে তার পসরা সাজিয়ে বিক্রির আশায় বসে। সন্ধে সাতটা অবধি আরতি, ততক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকা আর কী। পসরার মধ্যে শুকিয়ে যাওয়া ব্রহ্মকমল চোখে পড়ল। এখান থেকে আসল ব্রহ্মকমল দেখার জন্য নদী পেরিয়ে উঠে যেতে হয় বাসুকি তাল-এর উদ্দেশ্যে। পথেই মেলে ব্রহ্মকমল। তাল-এর আশেপাশেও আছে শুনেছি, স্বচক্ষে আর দেখা হয়ে ওঠেনি। ঠাণ্ডার

দাপট বাড়তে থাকায় ফিরে চললাম টেন্টের দিকে, প্রায় ১ কিমি হাঁটতে হবে। মন্দিরের কাছাকাছি কোনো থাকার জায়গা নেই। মন্দাকিনীর নতুন পথের পাড় বাঁধানো চলছে। জায়গাটা পুরোটাই অচেনা লাগছে। শুধু ব্যাকড্রপটাই অচল, অপরিবর্তিত। টেন্টে ফিরে আবার কিছু স্ন্যাক্সের সঙ্গে চা খেয়ে রাতের খাবারের কুপন কেটে নিলাম; ষাট টাকা জনপ্রতি। সন্ধেতে এখানে সৌরবিদ্যুৎ-এর আলোয় ক্যাম্পটা চলে। ক্যাম্পের পশ্চিমে নদীর দিকে সার দিয়ে টয়লেট তৈরি করে রাখা আছে, জলাধারও করা আছে। হেলিপ্যাডে দেখলাম কিছু মানুষ ভলিবল খেলছে। দৈনিক একঘেয়ে জীবনে কিছু আনন্দের অবতারণা আর কী! রাতের আহার বেশ তাড়াতাড়ি সারতে হল, দেরি করলে খাবার মিলবে না। আকাশ বেশ পরিষ্কার, মনে হল কাল সকালের দিকেও আকাশ পরিষ্কারই থাকবে। আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী সেই সময়ে আবার মন্দিরের দিকে যাব আর কিছু দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করব। খুব ভোরে উঠে দেখলাম বাইরে বড্ড কুয়াশা, তখন আর বেরোলাম না। সকাল সাতটা নাগাদ আকাশ পরিষ্কার হল। পরিকল্পনামত আমরা বেরিয়ে পড়লাম আশপাশের দৃশ্য উপভোগ করতে। তখন সবে কেদারনাথ শৃঙ্গে আলো পড়েছে। বরফঢাকা কেদারশৃঙ্গ যে কী অপরূপ লাগছে, তা ভাষায় বর্ণনা করা মুশকিল। ধীরে ধীরে কেদারনাথের পাশের শৃঙ্গগুলিও চকচক করে উঠল, স্বর্ণালোকের দ্যুতিতে।

কেদারনাথ মন্দিরের ব্যাকড্রপে সোনারোদমাখা পর্বতগুলোর আকর্ষণেই তো আমার আবার ছুটে আশা এই পথে। কেদার ডোমও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, বরফহীন একটি পর্বতও রয়েছে ঠিক মন্দিরের পেছনে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরো শৃঙ্গমালা রোদে ঝকঝক করে উঠল। আমার স্বাদপূরণ, সঙ্গে মিতারও। এবার ফেরার পালা। টেন্টে ফেরার পথে কিছুটা এগিয়ে আসতে আসতেই কানে আসছিলো হেলিকপটারের শব্দ। ওই শুরু হল কেদার দর্শনার্থীর ফেরি - গুপ্তকাশী থেকে। যারা গতকাল এসে পৌঁছেছিল, তারা আজ ফিরে যাচ্ছে। অনেকে দিনে দিনেও ফিরে যায়। আমরাও ফিরব; সেই এক-ই পাহাড়ি পথ ধরে, চারপাশের ছবি তুলতে তুলতে, ডিজিটাল ক্যামেরায় নয়, মনের।

~ [কেদারের আরও ছবি] ~

অধ্যাপনার পাশাপাশি অরুণাচল চ্যাটার্জি বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ানোটা অভ্যেসে পরিণত করেছেন। বিভিন্ন পরিবেশে উপস্থিত জীববৈচিত্র্য তাঁকে আকৃষ্ট করে আর তাই জলে-জঙ্গলে-পাহাড়ে ঘোরার নেশা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সহযোগিতা করে।

কেমন লাগল : - select -

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

[আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন]

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

তুঙ্গনাথের পথে

অরিন্দম পাত্র

ভোর ভোর ঘুম ভেঙে গেছিল। সাড়ে পাঁচটা বাজে। ভাল করে আলো ফোটেনি এখনো। আজ আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে উখিমঠ থেকে চোপতা। ওখানে সারাদিন থাকার কথা। পরের দিন ওখান থেকে সকালে বেরিয়ে তুঙ্গনাথে পৌঁছে রাত্রে কালি-কমলি ধরমশালায় থাকব। কিন্তু আমার সঙ্গী দুজন ইতিমধ্যেই রণে ভঙ্গ দিয়েছে। ওরা আর হাঁটাহাঁটির চক্করে পড়তে নারাজ। তাই আগামীকাল তুঙ্গনাথ দর্শন করতে আমি একাই উঠব চোপতা থেকে। কিন্তু রাত্রে থাকব না, তাই আর চন্দ্রশিলাও যাব না। অর্থাৎ চোপতায় আগামীকাল আমাদের থাকাটা এক দিন বাড়িয়ে নিতে হবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে চোপতার হোটেল মালিক দীনেশজী'র ফোনে কানেকশন পাচ্ছি না। তাই গিয়ে কথা বলা ছাড়া উপায় নেই। মনে পড়ল কলকাতার স্টিফেন হাউসে কালি-কমলির হেড অফিসে ষাট-পঁয়ষট্টি জনের পিছনে লাইন দিয়ে ধাক্কাধাক্কি করে তুঙ্গনাথে থাকার জন্য ফর্ম তোলার কথা। সব বেকার হয়ে গেল..!

এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে মন ফিরে এল উখিমঠে। সেই স্বর্গীয় ঘন্টা ধ্বনি আর উদাত্ত কন্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ ফের শোনা যাচ্ছে। ওমকারেশ্বর মন্দিরে প্রভাতী আরাধনা শুরু হয়েছে। ভোরের আলো ফুটতে চলেছে ধীরে ধীরে। বাইরে বারান্দায় চলে এলাম, মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ, সামনেই দিগন্ত জুড়ে বিরাজমান বিশালাকৃতির পর্বতশৃঙ্গ, কেদারনাথ! শ্রদ্ধায় আপনা থেকেই যেন মাথা নত হয়ে এল! এক না একদিন যেতেই হবে কেদারনাথ বাবাজীর দর্শনলাভের উদ্দেশ্যে।

আস্তে আস্তে আকাশে দিনশুরুর রঙ ধরতে শুরু করছে, আর কেদারনাথ শৃঙ্গতে সোনারঙের খেলা শুরু হয়ে গেছে। মুগ্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই খেলা দেখলাম। প্রকৃতির কী অপরূপ লীলা! তারপর রোদ উঠতে রুপোলী বর্ণধারণ। চিরকাল মনে রাখার মত দৃশ্য।

সকাল দশটা নাগাদ সকালের যৎসামান্য জলখাবার সেরে, বীর সিংজির পাওনাগন্ডা মিটিয়ে চোপতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। রাস্তা বেশিক্ষণের নয়। এক ঘন্টার আশেপাশে। মনোরম সব দৃশ্যপটের ভান্ডার সেই রাস্তার দুপাশে! চোপতা ঢোকার কিছুটা আগে দুগ্গলভিটায় একটু দাঁড়ালাম। চারিদিকে সবুজ তৃণভূমি, তার মাঝে যত্রতত্র সব টুরিস্টদের জন্য ক্যাম্প আর টেন্ট তৈরি করা হয়েছে রংবেরঙের, আর দূরে তুষারশুভ্র পর্বতমালা। সত্যিই দেশীয় সুইৎজারল্যান্ড! জানি এ ভাবে বলা উচিত না! সুইৎজারল্যান্ড এর সৌন্দর্য একরকম, আমার জন্মভূমির সৌন্দর্য আর একরকম! স্বকীয়তায় ভরপুর আমার দেশ। তবু যেহেতু চোপতাকে ভারতের সুইৎজারল্যান্ড বলা হয়,তাই এই প্রসঙ্গের অবতারণা!

যাইহোক, চোপতায় ঢুকে গেছি। একের পর এক মেডো'জ ক্যাম্প আশেপাশে ফেলে এসে চলে এলাম একেবারে শেষ প্রান্তে। হ্যাঁ, এবারে নামতে হবে। প্রচুর গাড়ি চারিদিকে পার্ক করা আছে। ওইতো ঘন্টা,আর সিঁড়ি উঠে যাচ্ছে। জয় বাবা তুঙ্গনাথ!!

গাড়ি থেকে নেমে দু-একজনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলাম হোটেল তুঙ্গেশ্বরের লোকেশন। ওই সিঁড়ি বেয়ে অল্প উঠেই ডানহাতি আমাদের হোটেল বা হোম স্টে যাই বলুন! দীনেশজীর সঙ্গে দেখা হল। কিন্তু কথা বলে বিনামেঘে বজ্রপাত ঘটল! উনি যা বল্লেন তা হল "স্যার জী", আগামীকাল ওনার কাছে কোন ঘর খালি নেই। আগামীকাল বেলা বারোটার মধ্যে ঘর খালি করে দিতে হবে আমাদের। আর আশেপাশে অন্য কোন হোটেলে ঘর পাওয়াও প্রায় অসম্ভব। পড়লাম অথৈ জলে! আগামীকাল তুঙ্গনাথে ওঠার কথা, কী করব আমি?

আমার অবস্থা দেখে দীনেশজীই সমাধানসূত্র বাতলে দিলেন। উনি বল্লেন "স্যার জী" এখন তো এগারোটা বাজে। "আজ মৌসম ভি সাফ আছে"....আপনি আজই বাবাজীর দর্শনে বেরিয়ে পড়ুন। ম্যাডাম আর বাবু নীচে এখানেই থাক। আপনি ধীরেসুস্থে দর্শন করে নেমে আসুন। রাতটা এখানে কাটিয়ে আগামীকাল বেরিয়ে পড়ুন। আপনাদের জন্য আগামীকাল আমি মুক্কুমঠে একটা হোম স্টে'র ব্যাবস্থা করে দেব। ওখানে আগামীকাল থাকবেন।

প্রস্তাবটা মনে ধরল। আর এছাড়া কিছু করারও নেই। মানসিক প্রস্তুতি নেওয়ার টাইমও পেলাম না। দীনেশজী বললেন, দুপুরে খাওয়ার টাইম তো পাবেন না। কিছু বানিয়ে দিই? আমি সম্মত হলাম। ওনার দ্রুতহাতে বানানো ঝাল ছাড়া একটা আলুর পরোটা খেয়ে ঘরে চলে এলাম। তাড়াতাড়ি করে কাঁধের ব্যাগ গুছিয়ে নিলাম। টর্চ, ছাতা, রেইনকোট, ওষুধের

প্যাকেট, জলের বোতল এইসব আর কি! ঘটনার আকস্মিকতায় আমার ছেলে হতবাক! বাবাকে এত দ্রুত এসেই বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে দেখে ও চিন্তায় পড়ে গেল। ওকে আদর করে, ওর মা'য়ের কাছে রেখে দীনেশজীর দেওয়া লাঠি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। শুরু হল আমার তুঙ্গনাথ যাত্রা।

কার্তিকস্বামী মন্দির ট্রেকের সময় ভোলানাথ বাবু বলে দিয়েছিলেন যে, তুঙ্গনাথের শুরুর ধাপগুলো দেখে ঘাবড়াবেন না যেন! বেশ খাড়াই। সত্যিই তাই। দীনেশজীর হোম স্টে থেকেই পিছু নিয়েছে একজন টাট্টুওয়ালা। "ও বাঙ্গালী দাদা, ঘোড়া লিজিয়ে না!" জটায়ুর মত আমারও উট বলুন, ঘোড়া বলুন সবেতেই খুব ভয়। তার ওপর খাদের পাশ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে যাতায়াত করার মত সিংহহৃদয় ব্যক্তি আমি নই। জোরের সঙ্গে দুদিকে মাথা নাড়তে নাড়তে দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে চললাম। কিন্তু গায়ের গরম পোষাক, সোয়েটার, জ্যাকেট, পিঠের ভারী ব্যাগ সব কিরকম অসহ্য ঠেকতে লাগল। মাথা গুলিয়ে উঠল। পারব তো?? আর যাইহোক অভ্যস্ত পদাতিক তো আমি নই! ৪ কিমি বহু দূর মনে হচ্ছে এখন। ১০০ মিটারও আসিনি হয়ত।
ঠিক সেই সময়, ঠিক সেই সময়...দেবদূতের মত একজন আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন...

আমি তখন দরদর করে ঘামছি। পিঠের ভারী ব্যাগের ওজন আর যেন নিতে পারছিনা। গায়ের মোটা জ্যাকেট, সোয়েটারের তলায় জামা একদম ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। বুকটা হাপরের মত ওঠানামা করছে হাঁপিয়ে উঠে। ঠিক তখনই সে সামনে এসে দাঁড়াল! মোটামুটি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ইয়ং এনার্জেটিক একটি ছেলে। বয়েস কত হবে? চব্বিশ-পঁচিশ। বা হয়ত

আরও কম! দেখেই মনে হল বাঙালি। তাকে হাত নেড়ে দাঁড়াতে বলে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লাম,"ভাই, উঠতে কতক্ষণ লাগছে? আমি তো মনে হচ্ছে আর পারবই না!" ও খুব ক্যাজুয়াল ভঙ্গীতে বলল, আমি তো দেড় ঘন্টায় উঠে গেছি। আমি তোতলিয়ে উঠে বললাম "না মানে! তোমার বয়েস আর আমার বয়েস! এক হল?" ও আমায় আশ্বস্ত করে বলল, "নো টেনশন! একদম ছোট ছোট স্টেপ ফেলতে ফেলতে এগোন। তাড়াহুড়োর তো কিছু নেই। ঢের সময় আছে হাতে! দেখবেন ঠিক পৌঁছে গেছেন!" ওর কথা শুনে যেন একটু হলেও আশার আলো দেখলাম। সত্তর আর আশির দশকের ফুটবলাররা যেরকম কোচ পি.কে.ব্যানার্জীর ভোকাল টনিকে উদ্বুদ্ধ হত, আমিও বাচ্চা ছেলেটির কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলাম। আশ্বাসবাণী শুনিয়ে আমার দেবদূত নেমে চলে গেল তার গন্তব্যের দিকে! হয়ত আর কোনোদিনই তার সঙ্গে দেখা হবেনা। কিন্তু তাকে মনে রেখে দেব সারাজীবন।

শিবজীর নাম স্মরণ করে শুরু করলাম ওঠা। যেখানে যেখানে খাদের ধারে রেলিং দিয়ে ঘেরা, সেখানে সেখানে বাঁ হাত দিয়ে রেলিং আঁকড়ে ধরে আর ডান হাতে লাঠি ভর করে উঠছি চার ঠ্যাঙে গল্পের কাকাবাবুর মত! আর যেখানে রেলিং নেই সেখানে আমি সৃজিত বাবুর ফিল্মের তিন ঠ্যাঙে কাকাবাবু হয়ে যাচ্ছি। বেশ খানিকটা উঠতে উঠতে অভ্যাস হয়ে গেল ব্যাপারটা। কার্তিকস্বামীর সঙ্গে এই রাস্তার তফাত এটাই যে কার্তিকস্বামীর তুলনায় রাস্তার খাড়াইটা অনেক বেশি। কিন্তু কার্তিকস্বামীর রাস্তা মারাত্মক এবড়োখেবড়ো ছিল, এই রাস্তা কিন্তু রীতিমতো পাথরে বাঁধানো।

কয়েকজন উঠতি বয়েসের ছেলেমেয়ে লাঠি ফাঠির তোয়াক্কা না করে আমাকে লজ্জা দিয়ে পাশ দিয়ে হনহন করে বেরিয়ে গেল! তবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত আমি এক ঘন্টায় মন্দিরে পৌঁছে গেলে আমাকে তো কেউ আর অলিম্পিক মেডেল দেবে না! এসেছি তুঙ্গনাথ বাবাজী'র দর্শনলাভের জন্য, নিজের শারীরিক সক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য নয়! তাই আমি কচ্ছপের মতই চলতে থাকলাম। ঘড়িতে টাইম দেখে নিয়েছিলাম, যখন শুরু করি ওঠা, বেলা এগারটা উনচল্লিশ মিনিট।

বেশ খানিকটা উঠেই একটা প্রশস্ত বুগিয়াল (সবুজ তৃণভূমি)...তার পাশে একটা ছোট চায়ের দোকান। উল্টো দিকে বায়ো টয়লেট। পেরিয়ে চলতে লাগলাম এগিয়ে। যেকোন ট্রেকিং রুট বা পায়ে চলার পথে মনের মত সঙ্গী থাকা খুব জরুরী। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাইই মনে হল। বাঙালি দেখলেই তাই গায়ে পড়ে আলাপ জমাতে থাকলাম। একসঙ্গে অল্প আলাপ জমাতে জমাতে উঠলে পথের ক্লান্তি একটু কম বোধ হয়! হালিশহরের ছোট ভাই রাজদীপের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। ও এসেছে বাবা, মা আর দিদির সঙ্গে। ওনারা পিছিয়ে পড়েছেন। ও এগোচ্ছে আমার সঙ্গে সঙ্গে। সাতপাঁচ গল্প করতে করতে আর ছবি তুলতে তুলতে এগোলাম দুজনে। একে অপরের ছবিও তোলা হল। বেশ কিছুটা ধাতস্থ বোধ করছি আপাতত। আমার আবার ক্যামেরার বাতিক। প্রতি পথের বাঁকে বাঁকে প্রকৃতির অপরূপ রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়ছি আর দাঁড়িয়ে পড়ছি। রাজদীপকে এগিয়ে যেতে বল্লাম। আসার আগে ভেবেছিলাম একটা ছোট ভিডিও বানাব। মাঝে মাঝে মোবাইল দিয়ে সেই শটগুলোও নেওয়া চলছে।

আলাপ হয়ে গেল হরিয়ানা থেকে আগত রাজেশজী'র সঙ্গে। উনি আর ওনার বন্ধু এসেছেন, কেদারনাথ দর্শন করে। তুঙ্গনাথ দর্শন করে আজই বদ্রীনাথের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাবেন। ওনারা আর আরও অনেকেই দেখছিলাম শর্টকাট মারছিলেন। রাস্তা ধরে না এগিয়ে এবড়োখেবড়ো পাথর টপকে হাঁচড়পাঁচড় করে উঠছিলেন। এতে দূরত্ব হয়ত কমানো যায়, কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম অনেকটাই হয়। আর এর জন্য খুব ভাল ট্রেকিং শু দরকার। এসবের কথা আমি মাথাতেই আনলাম না। দুই বন্ধু ওইভাবে হাঁচড়পাঁচড় করে উঠে এক খাদের মুখে চায়ের দোকানে আমার মুখোমুখি হলেন। বেঞ্চে বসে খানিক বিশ্রাম নেওয়া গেল। আমার থেকে চেয়ে জলও খেলেন দুজনে। তারপর ফের চলা শুরু। চায়ের দোকানদার বলে দিলেন,আরও বেশ খানিকটা উপরে উঠে যে চায়ের দোকান পড়বে, তখন জানবেন যে অর্ধেক রাস্তা পেরিয়ে এসেছেন। আর বাকি থাকবে ২ কিমি। তারপর কিন্তু চড়াই আরও বাড়বে।

ওখান থেকে বেরিয়ে এগিয়ে চললাম। রাজেশজী আর তাঁর বন্ধু বিদায় জানিয়ে এগিয়ে গেলেন শর্ট কাট মারতে মারতে। রাজদীপকে আর খুঁজে পাচ্ছি না। হঠাৎ এসে পড়লাম একঝাঁক প্রাণবন্ত মানুষের দলের মাঝে। আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড অভিজিৎ পাল মহাশয়ের অফিসকোলিগ সৌজন্য বাবু এবং তাঁদের বন্ধুরা তিন-চারজন কচিকাঁচা সমেত বিরাট টিম নিয়ে চলেছেন ওপরে। রাতেও থাকবেন কালি-কমলিতে। গল্প করার প্রচুর লোক পেয়ে গেলাম ফের। চারদিকে তখন বাঙালি গিজগিজ করছে। মনে মনে হেসে ভাবলাম,"তুঙ্গনাথের রাস্তায় যত বাঙালি দেখলাম অত বাঙালি ধর্মতলাতেও দেখিনা!"
দ্বিতীয় চায়ের দোকানটা এসে গেছে। হাফ রাস্তা পেরোতে পেরেছি তার মানে! এইখানে সৌজন্যবাবুদের টিমকে বিদায় জানিয়ে এগোতে হল। ওনারা এই দোকানে একটু রেস্ট নেবেন। আমিও অল্প রেস্ট নিয়ে এগিয়ে চললাম। কারণ আমাকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে আলো থাকতে থাকতেই নেমে আসতে হবে। যত ওপরে উঠছি চড়াই বাড়ছে। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য দাঁড়াতে হচ্ছে ঘন ঘন। অনেকটাই এগিয়ে এলাম। একজন ভদ্রলোক নেমে আসছেন, কপালে তিলক, পুজো দিয়ে নামছেন। হিন্দিতে শুধোলাম "আর কতদূর?" একগাল হেসে ইংরেজিতে উত্তর দিলেন "ফর্টিফাইভ মিনিটস মোর..." উচ্চারণ শুনে বুঝলাম দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছেন। আমার চারদিকে এখন মিনি ভারতবর্ষ! নানা জাতি, নানা মত, নানা পরিধান, কিন্তু তাও "বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান!"
যত ওপরে উঠছি আকাশের ঝকঝকে নীল ভাবটা উধাও হয়ে যাচ্ছে। মেঘ চলে আসছে। মেঘ এসে গালে ছুঁয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কথা বলে বুঝলাম আর আধঘন্টা বাকি। লাস্ট ল্যাপে আলাপ হয়ে গেল দমদমের সায়ন করের সঙ্গে। ওনার তুঙ্গনাথে থাকার ইচ্ছে আজ। কিন্তু কোন বুকিং নেই। বললেন চিন্তা করছি না এই নিয়ে। কোথাও না কোথাও ঠাঁই জুটেই যাবে। আমার জুতোটা দেখে উনি পাল্টানোর পরামর্শ দিলেন। বললেন ভাল ট্রেকিং শু নিন দাদা।
হাঁপ ধরছে খুব। কিন্তু আর বেশি দূর নেই। এসেই গেছি প্রায়। আর কতক্ষণ? মিনিট কুড়ি নাকি আরও কম?

ওই তো মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে! জয় বাবা তুঙ্গনাথ! আর চিন্তা নেই। তবে আমি স্পিড আর বাড়াচ্ছি না। ক্যামেরা আপাতত বন্ধ রেখেছি। কত ছবি তুলেছি নিজেই খেয়াল করতে পারছিনা। একটা গোটা মেমোরি কার্ড পুরো ভর্তি হয়ে গেছে। মন্দিরের সিঁড়ির কাছে এসে পড়েছি। সায়ন বাবুর কাছ থেকে আপাতত বিদায় নিতে হল। উনি রাতের আস্তানার খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।
সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উঠে পড়লাম। আমার মিশন কমপ্লিট। পকেট থেকে মোবাইল বের করে দেখি বাজে দুপুর দুটো উনচল্লিশ। কাঁটায় কাঁটায় তিন ঘন্টায় পৌঁছলাম। মন্দিরের সামনে লাইন পড়েছে পুজো দেওয়ার জন্য। দাঁড়িয়ে পড়লাম। এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম! চেনা চেনা সব মুখগুলোকে লাইনে দাঁড়িয়ে দেখলাম! সেই রাজদীপ, সেই রাজেশ, সেই নাম না জানা বয়স্ক কাকু! এক ঝলকে মনে হল তুঙ্গনাথের রাস্তার এই সফর কিছুটা যেন আমাদের জীবনের সফরের মত নয় কি? জীবনের রাস্তায় আমরা বাঁচার তাগিদে ছুটে চলি একে অপরকে টপকে, এগিয়ে চলি, কখনও বা পিছিয়ে পড়ি। কিন্তু এক না একদিন দেখা হয়েই যায় কোন এক প্রান্তে!

ভক্তিভরে পুজো দিলাম বাবার চরণে মাথা ঠেকিয়ে। পূজারিজীরা আলোচনা করছিলেন শুনলাম আজ রবিবার তাই স্থানীয় অনেক মানুষ এসেছেন। আর বাঙালি বাবুরা তো আছেনই। মন্দিরে প্রসাদ পাওয়া যায়না। পুজো সেরে কপালে তিলক এঁকে একটু নেমে এসে নীচের দোকান থেকে প্রসাদ কিনলাম বাড়ির জন্য! এরপর চন্দ্রশিলার রাস্তাটা একঝলক দেখে নিয়ে নীচে নামার পালা!

পেশায় চিকিৎসক (নাক কান ও গলা বিশেষজ্ঞ) অরিন্দম পাত্রের নেশা ছবি তোলা। এছাড়াও দেশের মধ্যে নানা জায়গায় ভ্রমণ করা তাঁর আর এক শখ।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন : 1
গড় : 5.00

Like Be the first of your friends to like this.

SocialTwist Tell-a-Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

সুন্দরী নরওয়ে

পদ্মাবতী মণ্ডল

~ নরওয়ের আরও ছবি ~

অনেকদিন থেকেই মনের মধ্যে ছোটবেলায় ভূগোল বইতে পড়া সেই নিশীথসূর্য, মেরুজ্যোতি, ইগলুর দেশ নরওয়ে ভ্রমণের ইচ্ছে ছিল। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে হঠাৎ করেই সুযোগ জুটে গেল। তখন আমি গবেষণাসূত্রে সুইৎজারল্যান্ডের বাসেল শহরে বসবাস করি। জুলাই মাসের শুরুর দিকে প্ল্যান হয়ে গেল। জার্মানির উত্তরে হামবুর্গ শহর থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হল গাড়িতে ২০ জুলাই বিকেল পাঁচটায়। কিরণদা চালাবে গাড়ি, সুস্মিতাবৌদি সামনে আর আমি একগুচ্ছ মালপত্রের সঙ্গে পিছনে। টানা বারোদিন ধরে কিরণদা আর বুম্বাই (দাদা আর বৌদি ওদের বিএমডাবলু গাড়িটাকে ওই নামেই ডাকে) আমাদের ভরসা। গন্তব্য ডেনমার্ক, সুইডেন, দক্ষিণ নরওয়ে হয়ে উত্তর নরওয়ের নরদকেপ অর্থাৎ পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরে যতদূর অবধি স্থলপথে যাওয়া যায়।

হামবুর্গ থেকে টানা পাঁচঘণ্টায় আমরা পৌঁছে গেলাম ডেনমার্ক-এর উত্তরের বন্দর ফ্রিড্রিক্সহাফেন-এ। সেখান থেকে চার ঘণ্টায় জাহাজপথে সুইডেন-এর বন্দর শহর গথেনবুরগ-এ। এই জাহাজগুলো এতটাই বড় হয় যে বড় বড় ট্রাক, বাস, গাড়ি, ট্রেন অবধি ঢুকে যায়। জাহাজের ভিতরেই রয়েছে রেস্টুরেন্ট, শপিং মল, বাচ্চাদের খেলার জায়গা ইত্যাদি। বুম্বাকেও জাহাজে তুলে নেওয়া হল। গথেনবুরগ-এ সারাদিন কিরণদাদের পরিচিত কয়েকজনের আতিথেয়তা গ্রহণের পর ওইদিন বিকেলে আমরা নরওয়ের ওসলোর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। সেদিন রাতে আমাদের জীবনে প্রথম তাঁবু খাটানো ও তাঁবুতে থাকার অভিজ্ঞতা হল। ওসলোর কাছাকাছি একটা ক্যাম্পিং প্লেসে। চারদিকে অনেক তাঁবু এবং কারাভান। স্ক্যান্দানাভিয়ান দেশগুলোতে নিরাপত্তার অভাব নেই বলে যেখানে সেখানে তাঁবু খাটান যায়। কিন্তু প্রধানত টয়লেট-এর অসুবিধার জন্যই ক্যাম্পিং প্লেসে তাঁবু খাটিয়ে থাকা। জুলাই মাস বলে সারারাত আলোর মধ্যেই ঘুমাতে হল।

পরদিন সকাল সকাল সব গুছিয়ে আবার বেরিয়ে পরলাম। ঠিক হল রাস্তায় কোন ভালো জায়গা দেখে প্রাতরাশ করা যাবে। জিনিসপত্র সব সঙ্গেই আছে। আর সেই ভালো জায়গা খুঁজতে গিয়েই হল বিপত্তি। একটা দুর্ঘটনা যার জন্য আমাদের বুম্বাকে হারাতে হল। এটা ভ্রমণকাহিনি বলে ওই দুর্ঘটনা নিয়ে আর বেশি কিছু লিখছি না। শুধু বলি যে এর জন্য আমাদের একটা গোটা দিন নষ্ট হল। ওইদিন রাত্রে আমরা ওসলো-র উতরে হনেফস নামে এক মফঃস্বল এলাকায় হোটেলে রাত্রিবাস করলাম। ওই দুর্ঘটনার দরুণ আমরা সকলে এত ক্লান্ত ছিলাম যে ক্যাম্পিং প্লেস খোঁজার আর উৎসাহ ছিল না। আর তাছাড়া খুঁজবই বা কিভাবে। বুম্বা যে অচল হয়ে গেছে। যাই হোক, ইনসিওরেন্স কোম্পানির দৌলতে আমাদের আর একটি গাড়ির ব্যাবস্থা হল । জোর বৃষ্টির মধ্যে সমস্ত জিনিসপত্র দুর্ঘটনাবিধ্বস্ত বুম্বা থেকে নতুন গাড়িতে স্থানান্তরিত করে বুম্বাকে চোখের জলে বিদায় দিয়ে নতুন উদ্যমে পরের দিন সকালে আবার যাত্রা শুরু করলাম।

আগের দিনের ওরকম বাজে অভিজ্ঞতা আর নতুন গাড়ি কিরণদার হাত সেট হতে সময় লাগবে এই ভেবে প্রথম দিকে বেশ একটু ভয় ভয় করছিল। তবে সুন্দরী নরওয়ের সৌন্দর্য খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের সেই ভয় ক্লান্তি সবকিছু মুছে দিল। একটু পরেই একটা অদ্ভুত গ্রামের দেখা পেলাম যেখানে লাল লাল বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট সব বাড়ি রয়েছে। ঠিক মনে হচ্ছে যেন এ গ্রামের কেউ কারোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে না। এরকম বাড়ি নরওয়ের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরে।

সেখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আমরা আবার রওনা দিলাম। কয়েক ঘণ্টা পর হঠাৎ দেখলাম পাহাড়গুলো সব ন্যাড়া হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে বরফ। পুরো ল্যান্ডস্কেপটা যেন হঠাৎই পালটে গেল। বুঝলাম আমরা অনেক ওপরে উঠে গেছি যেখানে ঠাণ্ডার জন্য তেমন গাছগাছালি জন্মায় না। সেখানে একটা হ্রদের ধারে আমরা দুপুরে খাওয়ার জন্য থামলাম। গাড়ি থেকে পোর্টেবল গ্যাস ও অন্যান্য সরঞ্জাম বের করে শুরু হল আমাদের বোহেমিয়ান জীবনের প্রথম পিকনিক। এসব দেশে এইরকম বোহেমিয়ান ট্যুরিস্টদের জন্য এখানে সেখানে বেঞ্চ টেবিল এসব পাতা থাকে। মেনুতে পাস্তার সঙ্গে একটা লেন্টিল স্যুপের মিশ্রণ। আর সেটাকে মশলাদার করতে বাসেল থেকে নিয়ে যাওয়া কাঁচা লঙ্কার ফোড়ন। মানে ইতালি, জার্মানি ও ভারতবর্ষ মিলেমিশে একাকার। সামনে হ্রদ, তার ওপাশে বরফ - এরকম প্রাকৃতিক পরিবেশে আমাদের প্রথম মধ্যাহ্নভোজনটাও জমে ক্ষীর। আবার যাত্রা শুরু।

নরওয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাদের আগেরদিনের দুর্ঘটনার রেশ মুছে দিয়েছে। এইটুকু দেশের মধ্যে এত সৌন্দর্য, এত বৈচিত্র্য। এই সবুজ, এই আবার ন্যাড়া পাহাড়, এই জঙ্গল, তো এখনিই আবার হ্রদ, এই বরফ, তো আবার পাহাড়ি নদী, কখনো সমুদ্র, কখনো ফিওরদ আবার পরক্ষণেই ঝরনার দেখা মিলছে। তারপর দেখতে পেলাম প্রথম ফিয়রদের যেটাকে

বাংলা ভাষায় আমরা খাঁড়ি বলি। অনেকটা কেরালার ব্যাক ওয়াটারের মত। শুধু এখানে দুদিকে সমতল ভূমির বদলে উঁচু উঁচু পাহাড়। মাঝে মাঝে আমরা কখনো সেইসব সৌন্দর্য আরও বেশি করে উপভোগ করার জন্য, কখনো ক্যামেরাবন্দী করার জন্য ও কখনোবা আমাদের গাড়িচালককে আরাম দেওয়ার জন্য, বা চা-কফি পানের জন্য ছোট ছোট বিরতি নিচ্ছিলাম। ওইদিন আমরা রাত আটটা নাগাদ লেয়ারডাল এ ক্যাম্পিং করলাম। রাতের মেনু ডাল ভাত ও পকোড়া।

পরদিন সকালেই স্নান এবং প্রাতরাশ সেরে গেলাম ওখান থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে একটি বিখ্যাত স্তিভ চার্চ দেখতে। জায়গাটা এতটাই নির্জন ও ফাঁকা আমরা তো প্রথমে খুঁজেই পাচ্ছিলাম না। পরে এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করতে স্তিভ চার্চের খবর পাওয়া গেল। নরওয়েতে মাতৃভাষা নরওয়েইআন হলেও সবাই মোটামুটি ইংরাজি বলে। তাই ওখানে ভাষার জন্য কোন ভাবনাচিন্তা করতে হচ্ছিল না যেটা ইউরোপের অন্য অনেক দেশের প্রধান সমস্যা। এবার স্তিভ চার্চের কথায় আসি। এই চার্চগুলো নরওয়ে স্পেশাল – পুরোটাই কাঠের তৈরি এবং কালো রঙের।

ওখান থেকে ফেরার সময় একটা ২৫ কিমি. লম্বা টানেলের ভিতর দিয়ে যেতে গিয়ে সে কী প্রচণ্ড ভয় আমার। পর পর বড় বড় গাড়ি একের পর এক ওভারটেক করেই যাচ্ছে ওই সরু দুই লেন-এর বোথওয়ে টানেল দিয়ে। শুধু ভয় হচ্ছিল এখনি না কিছু একটা ঘটে যায়। এরকম টানেল পুরো নরওয়েতে ছড়িয়ে আছে। সুইৎজারল্যান্ডের মতো পাহাড় কেটে কেটে গাড়ি যাতায়াতের জন্য এইসব টানেলগুলো বানানো। তারপর গাড়ি নিয়ে লোম-এর কাছে সরু পাহাড়ি রাস্তায় ঘুরে ঘুরে উঠতে গিয়ে আবার বিপত্তি। গাড়িটা খুব শক্তপোক্ত নয় বলে পাহাড়ে উঠতে গিয়ে ইঞ্জিনের ওপর চাপ পরে ইঞ্জিন থেকে প্রচুর ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর সেটা একটু ঠিক হতে আমরা আরও ওপরে একটা ভিউ পয়েন্টে গেলাম। সেখান থেকে কয়েকটা পর্বতশৃঙ্গের মনোরম দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

জার্মানির কিল শহরের দুই বাইক আরোহীর সঙ্গে পরিচয় হল। আমাদের মত ওরাও জার্মানি থেকে পুরো রাস্তা স্থলপথে বাইক নিয়ে এসেছে। দুপুরে ওই পাহাড়ের ওপরে গ্লেসিয়ারকে সামনে দেখতে দেখতে রান্না ও খাওয়া দাওয়া হল। খাওয়া শেষ হতেই কোথা থেকে যেন মুষলধারে বৃষ্টি নামল। আমরা গাড়িতে সবকিছু তাড়াতাড়ি তুলে আবার রওনা দিলাম। পরবর্তী গন্তব্য গাইরাঙ্গার পাস ও গাইরাঙ্গার ফিওরদ। সেখানে জাহাজে চড়ে গাইরাঙ্গার ফিওরদ এর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে নরওয়ের বিখ্যাত ঝরনাগুচ্ছ দেখলাম। পর পর সাতটি ঝরনার সমষ্টি এই ঝরনাগুচ্ছের নাম সেভেন সিস্টারস (সাত বোন)। জাহাজের গাইড এই সেভেন সিস্টারস এর অনেক প্রচলিত গল্প শোনাল। প্রায় দু ঘণ্টা পর পৌঁছলাম হেলেসিলত-এ। ওখানেই আমাদের ওইদিনের মত যাত্রা শেষ করে একেবারে ফিওরদ-এর ধারেই ক্যাম্পিং প্লেস-এ তাঁবু খাটালাম। কিরণদা তো সঙ্গে সঙ্গে ছিপ নিয়ে ফিওরদ-এ মাছের সন্ধানে বেরোলো এবং আমি আর বৌদি রাতের খাবারের আয়োজনে লাগলাম।

পরদিন ভোর হতেই একটা বিশাল বড় জাহাজ এসে লাগল ওখানে। ছোট্ট জনপদ মুখরিত হয়ে উঠল জাহাজযাত্রীদের কলকাকলিতে। আমরাও প্রাতরাশ সেরে রওনা দিলাম। পরের গন্তব্য ভয়ঙ্কর ত্রলস্তিগেন পাস। ওই সরু পাস দিয়ে একের পর এক গাড়ি, ক্যারাভান এমনকি বাস ট্রাকও পেরোচ্ছে। একটা কিছু আটকে গেল মানে সবার আটকে যাওয়া। একদিকে বিশাল নিচু খাত আর অন্যদিকে পাহাড়ের গায়ে ঝরনা। ছোটবেলায় পড়া সঈয়দ মুজতবা আলির যাত্রাপথের খাইবার পাসকে যেন স্বচক্ষে দেখলাম ও অনুভব করলাম।

এরপর বহু পথ পেরিয়ে দুপুর নাগাদ থামলাম আটলান্টিক রোড-এ। এই বিখ্যাত ৮ কিমি রাস্তাটির দুদিকেই সমুদ্র যেটা আটলান্টিক মহাসাগরে মিশেছে। তাই এই নামকরণ। বছরের এই সময়টাতে সমুদ্র শান্ত থাকলে শুনেছি নাকি শীতকালে অনেক সময় সমুদ্র উত্তাল হয়ে রাস্তা দিয়ে যাওয়া গাড়িগুলোকে পুরো ভিজিয়ে দেয়। ওখানে নেমে লাঞ্চ করলাম ও প্রচুর লোকজন ওখানে মাছ ধরছিল দেখে আমরাও ছিপ নিয়ে একটু মাছ ধরার বৃথা চেষ্টা করলাম।

ওইদিন রাত্রে আমাদের ক্যাম্পিং হল ত্রন্দহাইম-এর কাছাকাছি একটা জায়গায়। যত উত্তরে যাচ্ছিলাম তত দেখছি ক্যাম্পে তাঁবুর সংখ্যা কম ও কেবিনের সংখ্যা বেশি। হয়তো ঠাণ্ডা বাড়ার জন্য। আর প্রায় সব ক্যাম্পেই তাঁবু ব্যবহারকারীদের জন্য আলাদা কিচেন রয়েছে।

পরেরদিন সারাদিন টানা সাত ঘণ্টা শুধুই গাড়ি যাত্রা। মাঝে শুধু একবার লাঞ্চ ও বিকালের চা পানের জন্য দাঁড়ানো হয়েছিল। নরওয়ের এই অংশটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য একটু কম। ঘন একঘেয়ে জঙ্গল। তারই মাঝে কোথাও সুন্দর কিছু চোখে পড়লে নেমে ক্যামেরাবন্দি বা হৃদয়বন্দী করতে ছাড়িনি আমরা। মোইরানা-তে পৌঁছে ক্যাম্পিং প্লেস আর খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক কষ্টে দু-তিনটে দেখার পর রাত নটা নাগাদ একটাতে জায়গা পাওয়া গেল। সেদিন রাত্রে ঘুমানোর পর শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখি তাঁবুর ভিতরে চারিদিক জলে থইথই করছে। স্লিপিং ব্যাগের ভিতরেও পায়ের দিকটায় জল ঢুকে গেছে। ওই রাতেই কাপড় এবং টিস্যু পেপার দিয়ে সব জল মুছে ওইরকম ভিজে অবস্থাতেই কোনভাবে রাতটা কাটালাম।

পরের দিন সকালে যাত্রা শুরু করে দুপুরের দিকে পৌঁছলাম পোলার সার্কেল সেন্টার-এ। মানে সেখানে অক্ষাংশ ৬৬.৬৬°। আর আমার বাড়ি শান্তিনিকেতনের ঠিক তার অর্ধেক মানে ৩৩.৩৩°।

সে যাই হোক, সেখানে কিছু কার্ড ও স্মৃতিচিহ্ন কিনে আবার গাড়িতে উঠলাম। বিকেল চারটে নাগাদ পৌঁছলাম বোদোতে। ওখান থেকে আমরা সমুদ্রের মধ্য দিয়ে জাহাজসফরে যাব লোফোটেন দ্বীপ-এ। মাঝসমুদ্রে জাহাজ থেকে মধ্যরাত্রির সূর্য দেখার লোভে চার ঘণ্টার জাহাজটা ছেড়ে আমরা ছ'ঘণ্টার জাহাজটা নিলাম। জাহাজে একটা দলের সঙ্গে পরিচয় হল যারা জার্মানি থেকে ওই দ্বীপে যাচ্ছে শুধুমাত্র মাছ ধরার জন্য। মাছভক্ত বাঙালি আমরা। পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট মাছের দেশে এতদিন থেকেও মাছ না খাওয়ার দরুণ আমরা একেবারে মাছের জন্য মুখিয়ে আছি। তাই ওদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম- গল্পেন অর্ধং ভোজনং। লোফোটেন-এ যখন পৌঁছলাম মধ্যরাত্রি পেরিয়েছে। চারিদিকে আলো। ওখানে ক্যাম্পিং প্লেস না থাকায় ওই রাত্রিটা আমরা গাড়িতেই কাটানোর প্ল্যান করলাম সমুদ্রের ধারে একটা পারকিং প্লেস-এ। তার একদিকে সমুদ্র অন্যদিকে পাহাড়। অসাধারণ সৌন্দর্য। আলো থাকার দরুণ রাত একটা নাগাদ আমরা যখন রাতের খাবার খাচ্ছি, ওই পারকিং প্লেস এর অন্য গাড়ির লোকজনের কেউ যাচ্ছে মাছ ধরতে তো কেউ পাহাড়ে চড়তে। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। পরদিন সকালটা জীবনের সবথেকে সুন্দর সকালগুলোর মধ্যে একটা ছিল।

আবহাওয়াটাও ছিল চমৎকার। সকালে একটা ছোট্ট জেলেদের মিউজিয়াম দেখে আমরা মাছের খোঁজে এগিয়ে চললাম। আমরা বদ্ধপরিকর ওইদিন আমরা মাছ খাবই। গোটা দ্বীপটাই জেলেদের বাসস্থান। প্রায় প্রত্যেকটা ঘরেই বড় বড় শুকুই মাছের গুদামঘর। অনেক খোঁজার পর টাটকা মাছের গুদাম চোখে পড়ল।

খুব সস্তায় আমরা একটা তিন কেজি ওজনের মাছ কিনলাম। একটা লেক-এর পাশে গিয়ে মাছ রান্না, স্নান খাওয়া সম্পন্ন করে রওনা দিলাম ভাইকিং মিউজিয়াম-এর দিকে। সেখানে নরওয়ের পুরনো বাসিন্দা ভাইকিংদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অবগত হলাম। ওখান থেকে কিছু স্মৃতিচিহ্ন কিনে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলাম। লোফোটেন দ্বীপের দক্ষিণ দিক দিয়ে জলপথে ঢুকেছিলাম। এখন উত্তর দিক দিয়ে স্থলপথে আবার মূল ভূখণ্ডে ফিরে এলাম। এখানে হঠাৎ হঠাৎই চোখে পড়ছিল একটা সরু রেললাইন যেটা দেখে আমার অনেক আগে দেখা পোলার এক্সপ্রেস সিনেমাটার কথা খুব মনে হচ্ছিল। বারবার খুব মনে হচ্ছিল যেন সত্যিই পৃথিবীর একেবারে একপ্রান্তে এসে গেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা নারভিক পেরিয়ে ওইদিনের মত ক্যাম্পিং প্লেস-এ ঢুকলাম। রাত্রের খাবার খিচুড়ি আর মাছ ভাজা। সেদিন রাতেও প্রচুর বৃষ্টি হল। তবে তাঁবুর মধ্যে আগের রাতের মত অত জল ঢোকেনি।

পরের দিন সকালে যাত্রাপথে একটা সামি প্রজাতিদের মেলা পড়ল। সেখানে দোকান গুলো সামিদের বাড়ির মত। ভিতরে ওদের ব্যবহার করার জিনিসপত্র। ঠিক যেন সামিদের গ্রামে এসে গেছি।

এরপরের গন্তব্য ত্রমস। আর সেখানেই আমাদের নরওয়ে যাত্রার অফিশিয়াল সমাপ্তি। দুর্ঘটনার দরুণ একদিন নষ্ট হওয়ার কারনে আমাদের নরদকেপ যাওয়ার আশাটা আর পূর্ণ হল না। ত্রমস পৌঁছে সেদিন একটু এদিক ওদিক ঘুরে বাজার থেকে সালমন মাছ কিনে সন্ধেবেলা ত্রমস ইউনিভার্সিটিতে গবেষণারত এক কলিগের সাথে গ্রিলড সালমন, ভাত আর সালাড দিয়ে ডিনার সম্পূর্ণ হল।

পরদিন সকালে গাড়ি ফেরত দিয়ে হোটেলে ফিরে সারাদিন ঘুম। বিকালে আমি একাই বেরোলাম ত্রমস ঘুরতে ও ছবি তুলতে। পরদিন সকালে আমার ত্রমস থেকে ফেরার ফ্লাইট জুরিখ অবধি। ওসলোতে ছ'ঘণ্টার ফাঁকা সময়। ব্যাগপত্র এয়ারপোর্ট এর লকারে রেখে বাসে করে চলে গেলাম একা একাই ওসলো ঘুরতে। ওসলোর ভিজেল্যান্ড পার্ক, ফিওরদ সাইড ও আর দুর্গ ইত্যাদি ঘুরে পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাসে চড়ে যখন এয়ারপোর্টে ফিরলাম তখন জুরিখ-এর ফ্লাইট ছাড়বো ছাড়বো। লকার থেকে ব্যাগ নিয়ে ছুটে ছুটে ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ফ্লাইটে উঠলাম। তবে এই কদিনে যত কিছুই ঘটুক না কেন এই সফরটা আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা। ঝুলিতে এখন অভিজ্ঞতা আর স্মৃতি। হলফ করে বলতে পারি নরওয়ে আমার এখন অবধি দেখা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দেশ। সুইৎজারল্যান্ডে এতদিন বসবাস করেও আমি এটা সহজেই বলতে পারি। তাও যে কেন ইউরোপ ট্যুরের লিস্টে নরওয়ে ওপরের দিকে থাকে না কে জানে? হয়ত নরওয়ের সব জায়গা এখনো সাধারণ যানবাহনের পৌঁছানোর যোগ্য হয়ে ওঠেনি তাই। আমরাও কি গাড়িতে না গেলে এই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যময় সুন্দরী নরওয়েকে এত ভালো করে দেখতে পেতাম?

[~ নরওয়ের আরও ছবি ~]

বর্তমানে দক্ষিণ ভারতের তিরুপতি শহরে ভারতীয় বিজ্ঞান শিক্ষা এবং অনুসন্ধান সংস্থানের রসায়ন বিভাগে সহকারী অধ্যাপিকা হিসাবে কর্মরত পদ্মাবতী মণ্ডলের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনের কাছে নওয়াডাঙ্গাল নামক একটি গ্রামে জন্ম। ২০০৮ থেকে ২০১৮ অবধি প্রায় দশ বছর তিনি গবেষণার জন্য মিউনিখ, ফ্রাঙ্কফুর্ট (জার্মানি), বাসেল (সুইজারল্যান্ড), মার্সেই (ফ্রান্স) ইত্যাদি শহরে বসবাস করছিলেন, তখনই ইউরোপ তথা নরওয়ে ভ্রমণ। সবমিলিয়ে ইউরোপের পঁচিশটি দেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর।

কেমন লাগল : - select -

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

[আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন]

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

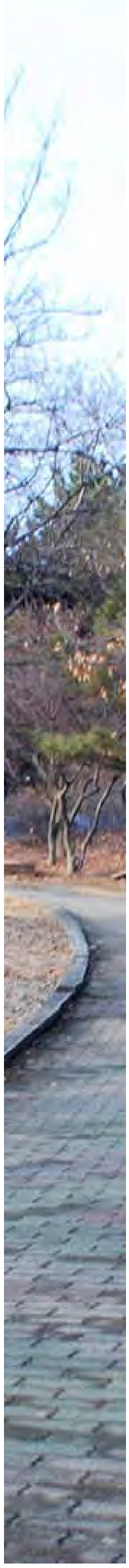

দক্ষিণ কোরিয়ার দেগু শহর ও জেজু দ্বীপ

সম্পত ঘোষ

দেগু : ইতিহাস থেকে বর্তমান

আপেলের শহর বা কখনও বুননের শহর নামে পরিচিত দেগু (Daegu) শহরের দূরত্ব আন্দং থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার, সময় লাগে প্রায় সোয়া এক ঘণ্টা। আন্দং বাস টার্মিনাল থেকে দেগু যাওয়ার বাস সারাদিন পাওয়া যায়। বর্তমান কোরিয়ার চতুর্থ বৃহত্তম শহর এটি। বেশ কয়েকবার এসেছি এই শহরে, অথবা এই শহরের ওপর দিয়ে গিয়েছি অন্য কোন গন্তব্যে। এবার উদ্দেশ্য দেগু জাতীয় সংগ্রহালয় (Daegu National Museum) আর ওরিয়েন্টাল মেডিসিন সংগ্রহালয় (Daegu Yangyeongsi Museum of Oriental Medicine) পরিদর্শন। সকাল সাতটা নাগাদ উঠে বেরিয়ে পড়লাম, আমার বাড়ি থেকে আন্দং বাস টার্মিনালের দূরত্ব লোকাল বাসে প্রায় এক ঘণ্টা, টার্মিনাল থেকে সাড়ে আটটার বাস দেগু-র উদ্দেশ্যে। টিকিট কেটে বাস টার্মিনালের ভিতরেই ব্রেকফাস্ট করে নিলাম। 'বিবিন ভাপ' আমার পছন্দের মেনু। ভাত, অঙ্কুরিত সয়বিন, সিদ্ধ শাক এবং মাশরুম, অল্প পরিমাণে ছড়ানো তিলের তেল আর স্যুপ এইসব মিলে তৈরি হয় 'বিবিন ভাপ' (Bibin-vap), আলাদা আলাদা করে উপকরণগুলি পরিবেশন করা হয়, একটি বাটিতে একসাথে মেখে নিতে হয়, বেশিরভাগ রেস্তোঁরাতে এর সাথে ডিমের পোচ দেওয়া হয়।

বর্তমান দেগু-র ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক। সমগ্র কোরিয়ান উপদ্বীপকে (Korean peninsula) একত্রিত করার অব্যবহিত পরেই সিল্লা সাম্রাজ্যের রাজা সিন্মুম (Sinmum) গিয়ংজু থেকে দেগু-তে রাজধানী স্থানান্তরিত করার কথা বিবেচনা করেন, যদিও তা সম্ভব হয়নি। 'শামগুক সাগি' (Samguk-Sagi)-তে এই উদ্যোগের কথা বর্ণিত আছে। ঐতিহাসিক কিম বুসিক (Gim Busik/ Kim Busik) দ্বারা চাইনিজ ভাষায় রচিত 'শামগুক সাগি' হল কোরিয়ার তিন রাজত্বের (গরিয়, সিল্লা, বাকজে) মূল্যবান ঐতিহাসিক নথি। জাতীয় সংগ্রহালয়ে রয়েছে এর বিবরণ। দেখলাম কাঠের গায়ে খোদাই করে লেখার উপায়। দেগু সংলগ্ন অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে প্রাচীন এবং নব্য প্রস্তর যুগের বিভিন্ন পাত্র, অস্ত্র, এবং পরবর্তী সময়কালের মৃৎপাত্র, মৃৎ নির্মিত বস্তুর নিদর্শন পাওয়া যায়। খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৩০০ সময়কাল 'মুমুন মৃৎ কাল' (Mumun pottery period) নামে পরিচিত। এই সময়কালের মধ্যেই পর্বতের পাদদেশে কোরিয়ান গ্রাম্য ব্যবস্থা প্রথম স্থাপিত হয়। প্রধানত ধান চাষ এবং পশুপালন ছিল জীবনধারনের উপায়, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস। জানা যায়, খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে ব্রোঞ্জের ব্যবহার হত শাসকের প্রতীক হিসাবে। এগিয়ে চললাম সেইসব নিদর্শন দেখতে দেখতে।

জাতীয় সংগ্রহালয়ের অভ্যন্তরে তিনটি প্রদর্শনী (gallery) রয়েছে। পুরাতত্ত্ব প্রদর্শনীতে রয়েছে প্রাচীন এবং নব্য প্রস্তর যুগ থেকে সময়কাল অনুসারে কোরিয়ার তিন সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন। কোরিয়ার ইতিহাসে, সভ্যতায় এই তিন সাম্রাজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম; গোগোরিয় রাজত্বের শক্তি এবং রাজত্ব বিস্তার, বাকজে রাজত্বের বানিজ্যে এবং বানিজ্যের খাতিরে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, এবং সর্বোপরি সিল্লা রাজত্বের উপদ্বীপটিকে ঐক্যবদ্ধ করা। কলা এবং ইতিহাস প্রদর্শনীতে রয়েছে বৌদ্ধ সংস্কৃতির নিদর্শন। প্রস্তর এবং ব্রোঞ্জ (গিলটি করা) নির্মিত ভগবান বুদ্ধের মূর্তিগুলি খ্রীস্টপূর্ব ৫৭ থেকে ৬৬৮ খ্রীস্টাব্দ সময়কালের মধ্যেকার। বৌদ্ধধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রভাব কোরিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। সপ্তম শতাব্দীতে সিল্লা রাজত্বও বৌদ্ধধর্মকে সরকারী ভাবে গ্রহন করলে বৌদ্ধ ভাস্কর্য উল্লেখযোগ্য ভাবে উন্নতিলাভ করে। সিল্লা সাম্রাজের দ্বারা তিন সাম্রাজ্যের একীকরণের পরে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ আরও বেশি প্রচলন পায় এবং অষ্টম শতাব্দীতে বুদ্ধমূর্তি ভাস্কর্য এক নান্দনিক ঐক্যের প্রতীক হিসাবে শীর্ষস্থানে পৌছয়। পরবর্তীকালে যদিও তা এই উজ্জ্বলতা হারায় এবং বিভিন্ন আঙ্গিকের মূর্তি নির্মাণ দেখা যায়। এই আঙ্গিকগুলি প্রধানত হাতের বিভিন্ন মুদ্রা যা আসুরিক শক্তি বিনাশকারী বলে ধারণা করা হয়। তৃতীয় প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু হল ঐতিহ্যগত লোক-সংস্কৃতি এবং জীবন। ইয়েওংনাম (Yeongnam) অঞ্চলের 'সেনবি' (Seonbi) সংস্কৃতি আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায় এই গ্যালারিটিতে। ঐতিহ্যমণ্ডিত রঞ্জন পদ্ধতি (dyeing), স্থানীয় উদ্ভিদ বা অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত রঞ্জক (dye), নানান দেশের ফেব্রিক (fabric) শৈলী, কাপড় বোনার পদ্ধতি, বিভিন্ন ঔষধি গাছ-গাছড়ার (herb) ব্যবহার, ইত্যাদি দেখান হয়েছে এখানে। দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ আটকে গেল শাড়িপরিহিত এক মহিলার প্রতিকৃতি দেখে, এখানে স্থান পেয়েছে ভারতীয় নারীবেশ। এছাড়াও রয়েছে রাজবেশ, আধিকারিক বেশ, বিবাহের বেশ, পুরুষ ও নারীর নানা বেশের নমুনা। এরপর দেখলাম 'দদংসিয়ন কনফুসিয়ান অ্যাকাডেমি'-র (Dodongseowon Confucian Academy) একটি প্রতিলিপি।

জাতীয় সংগ্রহালয়ের বাইরে রয়েছে একটি বহিরাঙ্গন প্রদর্শনী। পাঁচতলা একটি প্রস্তর নির্মিত প্যাগোডা রয়েছে এখানে। বেড়িয়ে এসে পায়ে হেঁটে যাওয়ার একটি রাস্তা রয়েছে দেখে সেটি ধরে হাঁটতে থাকলাম, ফুল আর গাছের বাগান রয়েছে রাস্তা বরাবর। এই প্রসঙ্গে একটি কথা জানিয়ে রাখি যে সংগ্রহালয়ের ভিতরে ছবি তোলায় নিষেধ রয়েছে, তাই ভিতরের ছবিটা মানসপটে নিয়েই ফিরতে হল।
দেগু জাতীয় সংগ্রহালয় থেকে বেরিয়ে এবার বাড়ি ফেরা। আসার সময় ট্যাক্সিতে এসেছিলাম কিন্তু ফেরার সময় ট্যাক্সি পাওয়া খুব সহজ হল না। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বাস ধরলাম দেগু বাস টার্মিনালে ফেরার জন্যে। এদেশে সাধারণ মানুষ খুব বেশি ইংরেজি বলেন না, কিন্তু একজন ছাত্র খুব সুন্দরভাবেই ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিল বাসরাস্তা আর রুট নম্বর। এবার ফেরা নিজের শহরে, আন্দং–এ।

আগের দিন-ই ভেবেছিলাম 'দেগু ইয়াংনিয়ংসি ওরিয়েন্টাল মেডিসিন সংগ্রহালয়' দেখে আসব কিন্তু তা সময়ের অভাবে সম্ভব ছিল না। তবে কয়েকদিনের মধ্যেই একটা সুযোগ এল। আমার এক বন্ধু আর দুই অধ্যাপক উৎসাহিত। এমনিতে ওরিয়েন্টাল মেডিসিন নিয়ে সারা বিশ্ব কৌতূহলী, যেমনটা আমাদের আয়ুর্বেদ নিয়ে। দ্বিপ্রাহরিক আহার সেরে বেরিয়ে পড়লাম, একই পথ আবার। যখন উপস্থিত হলাম ওরিয়েন্টাল মেডিসিন সংগ্রহালয়ে তখন প্রায় আড়াইটে বাজে। প্রায় সাড়ে তিনশ বছর পুরনো এই ওরিয়েন্টাল মেডিসিনের ইতিহাসকে সংরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে ১৯৯৩ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হয় এই কেন্দ্রটি। জিনসেং, হরিণের শিং, বিছে, ওষধি গাছ ইত্যাদির ব্যবহারের বিবরণ রয়েছে প্রদর্শনীতে। ওরিয়েন্টাল মেডিসিনের ইতিহাস, ফিট বাথিং (feet bathing), প্রদর্শনী, ঔষধি বিক্রয়কেন্দ্র ইত্যাদিও রয়েছে এখানে। বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল প্রদর্শনীতে। এবার রাতের খাওয়ার সময় হল, প্রায় সাড়ে ছয়টা। এখানে লোকে সন্ধ্যাতেই রাতের খাওয়া সেরে নেয়, এটাই রীতি। আজকের মেনুতে চিংড়ি (tiger prawn), তবে রন্ধনপদ্ধতি আমাদের থেকে ভিন্ন। পরিষ্কার করা বেশ বড় বড় চিংড়িগুলিতে নুনের প্রলেপ দেওয়া, গরম কড়াইতে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই সেগুলি লাল হয়ে যাচ্ছে, তারপর পরিবেশন এবং সবশেষে ভাত আর টফু (tofu) স্যুপ। সয়বিনের দুধ থেকে প্রস্তুত একপ্রকার খাবার টফু।

ধারণা করা হয় যে সয়বিনের দুধ নিষ্কাশন এবং টফু তৈরির পদ্ধতি চিনে আবিস্কার হয়। এবার ফেরা।

জেজু আইল্যান্ড : আগ্নেয়গিরি দ্বীপ
এবারের গন্তব্য জেজু আইল্যান্ড (Jeju island), দক্ষিণ কোরিয়ার সর্ববৃহৎ দ্বীপ। দেশীয় মানুষের তো বটেই, পৃথিবীর পর্যটন মানচিত্রে নিজের জায়গা করে নিয়েছে কোরীয় উপদ্বীপের একেবারে দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত এই আগ্নেয় দ্বীপটি। স্বয়ংশাসিত জেজু আইল্যান্ড দক্ষিণ কোরিয়ার একটি প্রদেশ (Jeju -do; 'do' বা 'দো' কথাটির অর্থ province বা প্রদেশ)। যাত্রা শুরু হলো দেগু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (Daegu International Airport) থেকে। নিখাদ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাওয়া নয়, কর্মসূত্রেই তিনদিনের জন্যে যাওয়া, উদ্দেশ্য অতি ক্ষুদ্র এক পরজীবী mite (যা মৌমাছির কলোনির জন্যে খুবই ধ্বংসাত্মক) এবং এক ধরণের আলুর কীটের (pest, যা আলুর ফলনের জন্যে ক্ষতিকারক) জরিপ (survey) করা আর তারই মধ্যে যতদূর সম্ভব দেখে নেওয়া জায়গাটাকে, জানিনা আবার কখনও সুযোগ পাব কিনা! প্রায় দুই মিলিয়ন বছর পূর্বে অগ্নুৎপাতের মাধ্যমে এই দ্বীপের সৃষ্টি হয়। পূর্ব-পশ্চিম বরাবর প্রায় ৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ আর উত্তর-দক্ষিণ বরাবর প্রায় ৩১ কিলোমিটার প্রস্থ দ্বীপটির মোট আয়তন ১৮৪৭ বর্গ কিলোমিটার। প্রায় এক ঘন্টা দশ মিনিটের যাত্রা। জেজু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলাম প্রায় সকাল এগারটায়। বিমানবন্দরের বাইরে গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। যদি ড্রাইভিং লাইসেন্স (ইন্টারন্যাশনাল অথবা কোরিয়ান) সঙ্গে থাকে তবে এখান থেকে গাড়ি নিয়ে পুরো দ্বীপটা অনায়াসে ঘোরা যায়। এদেশে গাড়ি রাস্তার ডানদিক দিয়ে চলে আর চালকের আসন বামদিকে অর্থাৎ আমাদের দেশের ঠিক বিপরীত, প্রথম প্রথম মানিয়ে নেওয়া একটু কঠিন বটে তবে সময়ের সঙ্গে তা অভ্যাসে পরিণত হয়।

জেজু আইল্যান্ড-র অন্যতম দ্রষ্টব্য হালাসান জাতীয় উদ্যান (Hallasan National Park)। হালাসান আবার মাউন্ট ইয়ংজুসান (Mt. Youngjusan) নামেও পরিচিত। ১৯৭০ সালে হালাসান জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা পায়। প্রধান মাউন্টেন-র পাশে তিনশ আটষট্টিটি পরজীবী আগ্নেয়গিরি (parasitic volcano) রয়েছে। ২০০২ সালে হালাসান ইউনেস্কো বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ(UNESCO Biosphere Reserve) মনোনীত হয় আর ২০০৭ সালে এটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট (World Heritage Site) হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। ১৫৩.১১২ বর্গকিলোমিটার জুড়ে অবস্থিত হালাসান প্রধানত ব্যাসল্ট জাতীয় শিলা দিয়ে গঠিত এবং উচ্চতায় প্রায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৯৫০ মিটার, যা দক্ষিণ কোরিয়ার উচ্চতম পর্বত। সেনোজোয়িক যুগে (Cenozoic era) অগ্নুৎপাতের দ্বারা সৃষ্ট হালাসান পর্বতের সাতটি ট্রেইল রয়েছে। এগুলি হলো Eorimok trail (৬.৮ কি.মি.), Yeongsil trail (৫.৮ কি.মি.), Seongpanak trail (৯.৬ কি.মি.), Seokgulam trail (১.৫ কিমি.), Gwaneumsa trail (৮.৭ কি.মি.), Donnaeko trail (৭ কি.মি.) এবং Eoseungsaengak trail (১.৩ কি.মি.)। একদম শৃঙ্গে রয়েছে crater লেক (Crater lake) যার নাম 'Baekrodam'। Crater পর্যন্ত ট্রেক করার সময় হাতে ছিল না, অগত্যা প্রায় ৫ কি.মি. চলার পর ফিরে আসতে হলো জাতীয় উদ্যানের পর্যটন কেন্দ্রে। বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। অতএব এবার ফিরতে হবে, সূর্যও পশ্চিমে ঢলে পড়েছে।

ফেরার পথে চোখে পড়ল পাথরের তৈরি 'বৃদ্ধ ঠাকুরদা-র' (old grandfather) মূর্তি, কোরিয়ান ভাষায় যার পোশাকি নাম দোল হেরিউব্যাং (Dol Hareubang)। লোক ঐতিহ্য তথা জেজু আইল্যান্ড-র প্রতীক এই Dol Hareubang। পূর্বে বিভিন্ন নাম যথা ইউসিওকমক(Useokmok), মিউজিওকমক (Museokmok) অথবা বাইওকসুমেওরি (Byeoksumeori) নামে পরিচিত ছিল। ১৯৭১ সালে Dol Hareubang সরকারি নাম হিসাবে বিবেচ্য হয়। স্থানীয় বিশ্বাস এই যে Dol Hareubang 'খারাপ' কিংবা 'দৈত্য'র হাত থেকে সমাজকে সুরক্ষা প্রদান করে।
কোনো জায়গার খাদ্যাভ্যাস ওই স্থানের বাস্তুতন্ত্রের উপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল, পারিপার্শ্বিক বাস্তুসংস্থান থেকেই মানুষ তার প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং ঔষধি সামগ্রী সংগ্রহ করে এসেছে প্রাগৈতিহাসিক সময়কাল থেকেই এবং আজও বিভিন্ন জনজাতি তার (শারীরিক আর পরিবেশের সংযোগের) জিনগত স্বাক্ষর বহন করে নিয়ে চলেছে। জেজু আইল্যান্ড-র মাটি উর্বর নয়, তার উপর ঝোড়ো আবহাওয়া, আর তাই পূর্বে এখানে বিশেষ চাষাবাদ সম্ভব ছিল না, কাজেই খাদ্যসংগ্রহ মূলত নির্ভর করত সামুদ্রিক প্রাণী আর উদ্ভিদের (শৈবাল প্রধানত) ওপর। পরিবারের পুরুষরা গভীর সমুদ্রে যখন মাছ ধরতে যেত

কয়েক সপ্তাহের জন্য তখন পরিবারের অন্যের সকলের জন্যে খাদ্য সংস্থানের দায়িত্ব বর্তাত পরিবারের নারীর উপর। অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে তাঁরা শিখেছিলেন সমুদ্রে ডুব দিয়ে অক্টোপাস (Octopus), ক্ল্যাম (Clam), এবালন (Abalone), সি-উইড (Sea weed) ইত্যাদি সংগ্রহ করতে। স্থানীয় কোরীয় ভাষায় এঁদের Haenyo বলা হয় যার অর্থ 'সমুদ্র-নারী' (Sea-woman)। Haenyo-দের গড় বয়স পঁয়ষট্টি, অনায়াসে এঁরা ১০ থেকে ২০ মিটার গভীরে ডুব দিয়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে থাকেন। অলস সকালে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের পারে বসেছিলাম তখন দেখা হল একজন haenyo-র সাথে। তাঁর ভাষা আমি বুঝিনা, কিন্তু ভাষা যে মনের ভাব প্রকাশের জন্যে বাধা হয়ে ওঠেনা তা আরও একবার উপলব্ধি করলাম।

গবেষণাগারে কাজের থেকে অব্যাহতি পেলেই সম্পত ঘোষ বেরিয়ে পড়েন নতুন কিছুর খোঁজে। সাইকেল চালানোটা খুব মিস করেন, আজকাল হয়ে ওঠেনা। বই পড়া আর বেড়ানোর পরিকল্পনা করাটা চালিয়ে যাচ্ছেন।

কেমন লাগল : - select -

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ছুটির আড্ডা

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

কেরালার থেইয়াম উৎসব

পঙ্কজ দত্ত

~ থেইয়ামের আরও ছবি ~

আজকের ভ্রমণকাহিনি থেইয়াম (Theyyam) নামক এক উৎসবকে কেন্দ্র করে। আমরা ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা থেকে এই উৎসব দেখতে কেরালা গিয়েছিলাম। থেইয়াম কেরালার কান্নুর-এ পালিত হয়। প্রথমে কলকাতা থেকে ফ্লাইটে করে পৌঁছলাম ম্যাঙ্গালোর। সেখান থেকে ট্রেনে পাইয়ানুর। তারপর অটো রিজার্ভ করে ঠিক সন্ধেবেলায় পৌঁছলাম গন্তব্যস্থলে। যেহেতু ফ্লাইট ছিল তাই একদিনেই পৌঁছে গিয়েছিলাম। পৌঁছে সেদিন রাতেই আবার বেরোতে হবে। একটু অবাক হয়েছিলাম। আসলে যদিওবা সারাদিন ধরেই চলে, কিন্তু রাতেই আসল উৎসব হয়। এই উৎসব পুরো পাইয়ানুর-এ এক জায়গায় হয় না, বিভিন্ন জায়গায় পালিত হয়। পাইয়ানুর, কান্নুরের খুব কাছেই।
রাতে বেরিয়ে একজনের বাড়িতে যেতে হল। একটু আশ্চর্য হলাম, ভাবলাম, সঠিক জায়গায় এলাম তো! তারপরে দেখলাম, শয়ে শয়ে লোকজনের ভিড়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরে, হঠাৎ দেখি, একটা জায়গা কাপড় দিয়ে ঘেরা। খুব জানতে ইচ্ছে হল যে ভেতরে কী হচ্ছে। স্থানীয় এক বাসিন্দাকে জিজ্ঞাসা করে ঢুকে পড়লাম তার ভেতরে কৌতূহল মেটাতে। দেখলাম, চার-পাঁচজন মিলে একটা মানুষকে অদ্ভুত আকারের কাপড় দিয়ে সাজাচ্ছেন।

জানতে চাইলাম, ওরকম সাজাচ্ছেন কেন? তাঁরা বললেন, দাদা উনিই তো থেইয়াম-এর আজকের মূল আকর্ষণ। কথাটা ঠিক ধরতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, আকর্ষণ, মানে? বললেন, আপনি বোধহয় নতুন এসেছেন তাই না? বললাম, আমি প্রথমবার এসেছি। বললেন, তাহলে শুনুন, এই উৎসবে যা যা জামা কাপড় দেখছেন এগুলো সব আমরা সারা রাত বসে নিজেদের হাতে বানিয়েছি। শুনে আমি তো অবাক! বললাম, বলছেন কি! এগুলো সব আপনারা বানিয়েছেন! উনি বললেন আমরাই বানিয়েছি। তারপরে বললেন এই পোশাক, ওই যে ভদ্রলোককে দেখছেন, ওনাকে পরানো হবে। তাহলে, ওনাকে পুরো আমাদের ভগবানের মতন লাগবে। এমনকি কথায় বলে, ওনার ওপরে ভগবানের ভর হবে। উনি এই পোশাক পরে, ওই যে মন্দির আছে, তার সামনে নাচবেন, মনে হবে যেন স্বয়ং ভগবান মর্ত্যে নেমে এসেছেন। তারপরে সবাইকে আশীর্বাদ করে প্রার্থনা সেরে উৎসব শেষ হবে।

আমরা এরকম বিভিন্ন ধরণের থেইয়াম বিভিন্ন জায়গায় দেখলাম। এমনকি কিছু কিছু থেইয়াম তো আগুনের ওপর দিয়ে লাফায়। কী ভয়ঙ্কর! না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। বিভিন্ন জায়গায় এই বহু প্রাচীন উৎসবের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। সব দেখে, ছবি তুলে রাখলাম স্মৃতি হিসেবে। ফেরার দিন মন খুব খারাপ হয়ে গেল। বলে এলাম আবার আসব এই উৎসবের অংশ হতে।

হলদিয়ার আই ভি এল ধুনসেরি পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিস প্রাইভেট লিমিটেডে কর্মরত পঙ্কজ দত্তের আগ্রহ ফটোগ্রাফি এবং অ্যাডভেঞ্চার ভ্রমণ। তাঁর কথায়, জীবনে বাঁচার জন্য যেটাই করতে হবে ভালোবেসে করতে হবে তাহলেই জীবনের মজা পাওয়া যাবে। জীবন ভারী সুন্দর।

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

বিষ্ণুপুরের কৃষ্ণরাই মন্দিরের টেরাকোটার কাহিনি

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

বিষ্ণুপুর ভ্রমণে যাননি এমন মানুষের সংখ্যা অল্প। বিষ্ণুপুরের আকর্ষণ আলাদা। কী নেই এখানে, সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য বিষ্ণুপুর ঘরানার সঙ্গীত, বিশেষ ধরণের পোশাক যাঁদের পছন্দ তাঁদের জন্য বালুচরী, ঘর সাজানোর জন্য পোড়ামাটির ঘোড়া, আর সংস্কৃতিবানদের জন্য মন্দিররাজি। মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ (১৬৫৫) প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত পোড়ামাটির কৃষ্ণরাই মন্দিরে এতো ভিন্নধর্মী টেরাকোটা ফলক রয়েছে যে শুধু এই মন্দিরটি দেখতেই একটা পুরো দিন লেগে যায়। এই প্রতিবেদনে রামায়ণ কাহিনির শুরুর একটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে।

দশরথের শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ

যুবরাজ কুমার দশরথের ইচ্ছা হলে তিনি সরযূ নদী তীরে গেলেন। রাত্রিকালে কোন পশু নদীতে জলপান করতে এলে তিনি শিকার করবেন এই আশায়। শব্দ শুনে তিনি লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম ছিলেন। তাই মৃগয়ার জন্য অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সময়টাকে বেছে নিয়েছেন।

অন্ধমুনির অভিশাপ প্রদান

মৃগয়া কালে কলসে জল পূরণের শব্দ শুনে তিনি ভাবলেন কোন পশু নদীতে জল পান করতে এসেছে। সেই শব্দ লক্ষ্য করে শর নিক্ষেপ করতেই মনুষ্য কন্ঠের আর্তনাদ শুনে চমকে উঠলেন। যুবরাজ দশরথ সরযূ তীরে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, এক তপস্বী নদীতে জল নিতে এসে শরাহত হয়েছেন। মৃত্যুপথযাত্রী তপস্বী জানালেন, তাঁর বৃদ্ধ এবং অন্ধ পিতামাতা পিপাসার্ত হয়ে অপেক্ষা করছেন। তাঁরা পুত্রের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

সপুত্র অন্ধমুনি দম্পতিকে দাহ করছেন দশরথ

কিছুক্ষণ পর তপস্বীর মৃত্যু হলে দশরথ তাঁর মৃতদেহ নিয়ে অন্ধমুনির সামনে উপস্থিত হয়ে প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়ে দুর্ঘটনার বিবরণ তাঁকে শোনালেন। পুত্রের মৃত্যুর সংবাদে গভীরভাবে শোকাহত পিতা দশরথকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, আমার মত তোমাকে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করতে হবে।
পুত্রশোকে সস্ত্রীক অন্ধমুনি বিলাপ করতে করতে প্রাণত্যাগ করলে দশরথ তিনজনকেই দাহ করে অযোধ্যা ফিরে গেলেন।

কৃত্তিবাস এই ঘটনার বর্ণনা করেছেন সুন্দর ভাবে -

শব্দভেদী জানে রাজা শব্দে এড়ে বাণ।
ছুটিল রাজার বাণ অগ্নির সমান।।
মহাশব্দে যায় বাণ তারা যেন ফুটে।
জল ভরিতে মুনি পুত্রের বুকে গিয়ে ফুটে।।

প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়ের নেশা বেড়ানো আর ছবি তোলা। বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা চোখের আড়ালে চলে যাওয়া টেরাকোটার মন্দিরশিল্পকে ক্যামেরার দৃষ্টিতে পুনরুদ্ধার করাই তাঁর ভালোলাগা। পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ভ্রমণ ও অন্যান্য লেখা।

☆☆☆☆☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে কর্মাটাঁড়ে

অজিত রায়

আজ বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের দুশো এক বছর পূর্ণ হলো। দিকে দিকে পালিত হচ্ছে এই পুন্য দিবস। এমনই একাধিক অভিনব শ্রদ্ধানুষ্ঠানে অংশভাক হবার সুযোগ এসে গেল আমার পরম সুহৃদ ভারত জ্ঞানবিজ্ঞান সমিতির জাতীয় স্তরের সাধারণ সম্পাদক ড. কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের হেফাজতে। অভিনব বলছি, কেননা বাঙলার বাইরে এযাবৎ এই মনীষীকে বাৎসরিক স্মরণের মাধ্যমে ধরে রেখে এসেছেন দোষে-গুণে সমৃদ্ধ বঙ্গমুরুব্বিরা। কিন্তু আজ ঝাড়খণ্ডের একশ্রেণীর বাঙালি-অবাঙালি, বিহারি, আদিবাসী, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষ সর্বস্তরের মানুষ বিদ্যাসাগরের জন্মোৎসব পালন করে এক অভূতপূর্ব ইতিহাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। এই উদ্যোগের সর্বময় কৃতিত্ব ভারত জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতির।

শুধু তাই নয়, বিদ্যাসাগর বা অন্য কোনও মহাপুরুষের এ ধরনের বর্ণাঢ্য স্মরণ-অনুষ্ঠানের আয়োজন এযাবৎ কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষেও অচিন্ত্যনীয়। বিশেষত, এহেন মহামারীময় দুর্বিপাকের দিনে এ ছিল আরও বিস্ময়কর।

কাশীনাথ ও আমি ধানবাদ থেকে সকাল নটা নাগাদ গাড়ি করে রওনা সবুজ বনসারি চেরা মসৃণ রাজপথ ধরে প্রথমে পৌঁছই জামতাড়ার দুর্গদাস ভান্ডারী প্রতিষ্ঠিত সন্ত এন্থনি স্কুলে। আমাদের সঙ্গে ধানবাদ থেকে জ্ঞানবিজ্ঞান সমিতির একদল সদস্য বাইকে সওয়ার হয়ে প্রায় একই সময়ে, এগারোটায়, পৌঁছে যান। পেছন থেকে ধেয়ে আসে আর এক দল বাইকের মিছিল, আড়াইশো কিলোমিটার সুদূর পূর্ব সিংভূমের পটমদা এলাকা থেকে। ইতিমধ্যে গিরিডি আর দুমকা থেকেও আরও প্রায় একশো মোটর বাইক। সবসুদ্দু প্রায় আড়াইশো নরনারীর উদ্দীপিত কেরবালা। যাঁদের বেশির ভাগই অবাঙালি। কেউ বাউরি, কেউ বেসরা, কেউ সিং, কেউ আনসারি, কেউ বা আলম মিঞা। তাঁদের অনেকেই বিদ্যাসাগরের জীবন, সংগ্রাম, দয়াধর্মিতা, তাঁর মহৎ আদর্শ, কর্মযুদ্ধ নিয়ে নিপুণ, নিখুঁত ও সুললিত বক্তব্য রাখলেন মঞ্চে। এ ছিল আমার কাছে অতীব বিস্ময়কর। আরও বিস্ময়কর,আগেই উল্লেখ করেছি, এই অভাবিত ঘটনাটি ঘটলো কোভিড-ভয়াবহতার দিনে। বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের সূচনা সম্ভবত এভাবেই হয়।

দুপুরে সারিবদ্ধ খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা রওনা দিলাম কর্মাটাঁড়ের উদ্দেশ্যে, যেখানে কেটেছিল বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনের প্রায় সতেরো বছর। শেষ জীবনে ঐকান্ত্য ও নির্জনতাই অর্থিত ছিল তাঁর। তাও পাননি। কলকাত্তাই নাগরিক জীবনের পরিসরে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি চলে আসেন তৎকালীন বিহারের আদিবাসী ও জঙ্গল অধ্যাসিত নির্জন কুলহি কার্মাটাঁড়ে। নিজস্ব পারিবারিক তথা কলকাতায় চারিপার্শ্বের জীবন তাঁর কাছে একান্ত দুঃসহ ও প্রতিকূল হয়ে পড়েছিল বলেই তিনি, ঈশ্বরচন্দ্র শান্তির নীড় বাঁধতে এই কর্মাটাঁড়ে এসে ইউরোপিয়ান মহিলা ডরোথির কাছ থেকে ৪৭০ টাকার বিনিময়ে একটি আমবাগান সমেত মোট চোদ্দো বিঘা জমি কিনে ছোট্ট একটি কুটির তৈরি করেন, নাম দেন 'নন্দনকানন'। রাতের স্কুল চালানোর জন্য মাঝখানে একটি হলঘর, একপাশে শোবার ঘর, অন্যপাশে পড়ার ঘর। বাড়িতে ঢোকার ডান দিকে নিজের হাতে লাগিয়েছিলেন তাঁর নিজের গাঁ বীরসিংহ থেকে আহরিত একটি কিষাণভোগ আমগাছও। বাগানের দেখভালের জন্য কালী মণ্ডল নামে এক মালিও ছিল তাঁর। কালীকে দিয়ে বাগানের শেষ প্রান্তে লাগিয়েছিলেন একটি ভাগলপুরি ল্যাংড়া আমগাছ। কার্মাটাঁড়ে বসেই তিনি 'সীতার বনবাস', 'বর্ণপরিচয়'-এর ৩য় সংস্করণের প্রুফ দেখেছেন।

কার্মাটাঁড় জায়গাটি ছিল সাঁওতাল প্রধান। তাঁদের সারল্যে মুগ্ধ হয়ে বিদ্যাসাগর বাকি জীবনটা সেখানেই কাটাবেন স্থির করেছিলেন। তা অবশ্য হয়নি। মাঝে মাঝে তাঁকে কলকাতায় আসতে হয়েছে। মৃত্যুও হয় কলকাতায়। সহজ সরল আদিবাসী মানুষের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন তিনি। দলে দলে সাঁওতাল বিদ্যাসাগরের কাছে আসতেন ভুট্টা বিক্রি করতে। আর বিদ্যাসাগর সেই ভুট্টা কিনে ঘরে রাখতেন। কাজ শেষে সাঁওতালেরা বিকেলে ঘরে ফেরার পথে খেতে চাইতেন বিদ্যাসাগরের কাছে। ওঁদের থেকে সকালে কিনে রাখা ভুট্টা খেতে দিতেন বিদ্যাসাগর। এলাকার আদিবাসীদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে তাঁদের কাছে জীবনদাতা ঈশ্বর হয়ে উঠেছিলেন তিনি। সেখানে ধাঙড়পল্লিতে গিয়ে তিনি স্বহস্তে কলেরা রুগির শুশ্রূষা করেছেন। বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন তাঁদের সহজ, সরল জীবন। তাদের ছিল না কোনও দুরাচার, দ্বিচারিতা বা কাপটিপনা। প্রতি বছর পুজোর সময়ে তিনি তাঁদের জন্য বস্ত্রাদি কিনতেন। শীতে কার্মাটাঁড়ে হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা। তখন মোটা চাদর কিনে গরিব মানুষের মধ্যে বিতরণ করতেন। কলকাতা থেকে বিভিন্ন ধরনের ফল নিয়ে এসে তাদের খাওয়াতেন। আজ ২৬শে সেপ্টেম্বর,২০২০, ২০১ তম জন্মদিনের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হলো এই চিরস্মরণীয় যুগপুরুষকে এক সহজ, সাধারণ, নির্জন, অনাড়ম্বর ও সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, যাতে কর্মাটাঁড়ের স্থানীয় মানুষের, বিশেষত বাঙালি সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ছিল না বললেই হয়। এ-কথা ঠিক যে নির্জনতা তথা অনাড়ম্বরতাই অর্থিত ছিল স্বয়ং বিদ্যাসাগরের। কিন্তু আজ 'নন্দনকাননে'র হাল দেখে অশ্রু ফুটল হৃদয়ে। এত অবহেলা? এত নিস্পৃহতা? চতুর্দিকে আগাছা আর ঘাসের আগ্রাসন। উন্নয়ন যেটুকু হবার কথা তার এক দশমাংস হলেও মন এতখানি বিষণ্ন হতো না। ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মভূমি বীরসিংহ বাঙালির আবেগে স্থান করে নিলেও কার্যত কর্মাটাঁড় আজও অবহেলিত। আমাদের এই কর্মাটাঁড় এবং নন্দনকানন হয়ে উঠুক বাঙালির আর এক তীর্থভূম। গুগল-এর পাতায় 'সাইবার ক্রাইমের স্বর্গরাজ্য জামতাড়া'হয়ে উঠুক 'বিদ্যাসাগরের অমর কর্মভূমি'।

ধানবাদের বাসিন্দা গদ্যকার এবং ঔপন্যাসিক অজিত রায় সম্পাদনা করেন একটি ভিন্ন মেজাজের ছোট পত্রিকা – শহর। ভালোবাসেন হঠাৎ করেই বেরিয়ে পড়তে রোমাঞ্চের সন্ধানে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher